ভে ত রে

নীতীশ উদ্যোগের বিরুদ্ধে বিহার ২
মহিলা আন্দোলন—চ্যালেঞ্জ ও কর্তব্য ... ৩-৪
ব্যাঙ্ক শিল্পে ২০ ডিসেম্বরের ধর্মঘট ... ৫
নয়া উদারবাদের সংকট ও ... চ্যালেঞ্জ ... ৬

আজকের দেশব্রতী

₹ ২

পত্রিকা প্রকাশিত হয় প্রতি বৃহস্পতিবার,
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮
বার্ষিক গ্রাহক — ১০০ টাকা
(৪৮টি সাধারণ সংখ্যা ও একটি বিশেষ সংখ্যা)
ষান্মাসিক গ্রাহক — ৫০ টাকা (২৬টি সংখ্যা)
১০টি বার্ষিক গ্রাহক একত্রে জমা দিলে
প্রতি সংখ্যায় ১টি পত্রিকা বিনামূল্যে

খণ্ড ১৯ সংখ্যা ৪৭ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির মুখপত্র ২৭ ডিসেম্বর ২০১২

দিল্লীতে গণধর্ষণের প্রতিক্রিয়ায় গণবিস্ফোরণ

দেশজুড়ে গণবিক্ষোভ—পুরুষতন্ত্র নিপাত যাক

‘‘দ্রুততার সঙ্গে ধর্ষণকারী ও যৌন হিংসাকারী অপরাধীদের শাস্তি সুনিশ্চিত করতে হবে’’
‘‘নারীর নিঃশর্ত স্বাধীনতার অধিকার চাই’’

দিল্লীতে গণবিস্ফোরণের পথে কদমে কদম মিলিয়ে এগিয়ে চলেছেন ছাত্র ও মহিলা সংগঠনের প্রতিবাদীরা

দিল্লীর রাস্তায় চলন্ত বাসে ২৩ বছর বয়সী কলেজ ছাত্রীকে দলবদ্ধভাবে ধর্ষণ ও বীভৎস আক্রমণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সারা দেশের মানুষ, বিশেষ নারী, করে ছাত্র ও যুবসমাজ লিঙ্গ-হিংসার প্রতিবাদে মুখর হয়ে জোরালো গণবিক্ষোভে সামিল হয়েছেন। একাধিক অস্ত্রোপচারের পর সেপটিসিমিয়ায় আক্রান্ত ছাত্রীটির শারীরিক অবস্থার ক্রমাগত অবনতি হচ্ছে।

ছাত্রীটি ও তার বন্ধু ১৬ তারিখ রাতে বাড়ি ফেরার বাসে উঠেছিল। সেখানে একদল যুবক তাদের উদ্দেশ্য করে খারাপ মন্তব্য করে। তার প্রতিবাদ করাতে ছেলে ও মেয়েটিকে ‘শিক্ষা’ দেয় তারা। লোহার রড দিয়ে মেরে ছেলেটিকে অজ্ঞান করে, মেয়েটিকে দলবদ্ধভাবে ধর্ষণ করে, রড দিয়ে পিটিয়ে নাড়িভুড়ি থেতলে, আধমরা অবস্থায় দুজনকে চলন্ত বাস থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়। ৪০ মিনিটের ওপর এই হিংস্র আক্রমণ চলতে থাকে। বাস চক্কর কাটতে থাকে রাস্তায়। কারুর চোখে পড়ে না। পুলিশের চেকপোস্টের তো নয়ই।

ঘটনার নৃশংসতায় শিউরে উঠেছে দেশের আমজনতা। একের পর এক হাড়-হিম করা লিঙ্গ হিংসার ঘটনায় জমা ক্রোধের এই বিস্ফোরণ

সাতের পাতায় দেখুন

দিল্লীর আগুন ছুঁলো কলকাতার রাজপথ

দিল্লীর রাজপথে ২৩ বছরের এক ছাত্রীর ওপর হওয়া ধর্ষণের ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দিল্লীর রাজপথে স্বতঃস্ফূর্ত গণআন্দোলনের রূপ নিয়েছে, যৌন হিংসার বিরুদ্ধে এই ধরনের প্রতিবাদ নতুন ইতিহাস তৈরি করেছে। সারা দেশের মানুষকে ধর্ষণের ঘটনাটি যেমন শিহরিত করেছে,তেমনি দিল্লীর রাজপথের আগুন নারী আন্দোলনের সীমানা ছাড়িয়ে দেশের নানা প্রান্তে জন্ম দিচ্ছে বৃহত্তর গণতান্ত্রিক প্রতিবাদের, আন্দোলনের। পাটনা, এলাহাবাদ, চেন্নাই সর্বত্রই বিক্ষোভ দানা বাঁধছে। কলকাতাতেও গত ২২ ডিসেম্বর স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদে পা মেলালেন অসংখ্য মানুষ। মিছিলের মাথা যখন বিড়লা তারামণ্ডলে, লেজ তখন ছিল ধর্মতলায়। একই উদ্দেশ্যে গত ২৪ ডিসেম্বর আইসা-অ্যাইপোয়া-আর ওয়াই এ-র ডাকে মিছিলে পা মেলালেন শ'য়ে শ'য়ে নারী-পুরুষ-ছাত্র-যুবা।

ডিসেম্বরের হিমেল হাওয়ার কামড়কে উপেক্ষা করে নোনাডাঙ্গার উচ্ছেদের সামনে লড়াই করা মহিলারা যেমন পা মেলালেন মিছিলে, তেমনি পা মেলালেন হুগলি-দুই চব্বিশ পরগণা ও কলকাতার ছাত্র-যুবরা। মিছিল দাবি তোলে পার্ক স্ট্রীট গণধর্ষণ সহ পশ্চিমবঙ্গের ধর্ষণ কাণ্ডে জড়িতদের শাস্তির, ধর্ষণের ঘটনার দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য ফার্স্ট ট্রাক কোর্টের। শ্লোগান উঠল—'পুরুষতন্ত্র নিপাত যাক'। একের পর এক ধর্ষণের ঘটনা আমাদের রাজ্যেও ঘটে চলেছে। আর মুখ্যমন্ত্রী দিল্লী কাণ্ডের প্রতিবাদ করলেও নিজের রাজ্যের ধর্ষণের ঘটনায় অবলম্বন করেছেন হিরন্ময় নীরবতা। মিছিল শুরু হয় সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে, আর শেষ হয় মেট্রো চ্যানেলের সামনে এসে। সেই মেট্রো চ্যানেল—যেখানে এই সরকারের আমলে জারি আছে অঘোষিত ১৪৪ ধারা। সেই সরকারি ফতোয়াকে অমান্য করে ছাত্র-যুব-মহিলারা পোড়ালেন মনমোহন সিং আর মমতা ব্যানার্জীর কুশপুতুল। আগুনে সেই পুত্তলিকা পুড়ে যাওয়ার সাথে সাথে আওয়াজ উঠল যৌন-হিংসার বিরুদ্ধে কার্যকরি ব্যবস্থা নেওয়ার প্রশ্নে সমান দায়িত্ব এই রাজ্য সরকারেরও। আইপোয়ার রাজ্য সম্পাদিকা চৈতালী সেন ও আইসার পক্ষ থেকে দেবমাল্য বক্তব্য রাখেন। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন সি পি আই (এম এল)-এর রাজ্য সম্পাদক পার্থ ঘোষ ও অন্যান্য নেতা-নেত্রীরা। যৌন নিপীড়নের বিরুদ্ধে সামনের দিনে আরও জঙ্গী আন্দোলনের সাক্ষী হবে কলকাতা, এই মিছিল তারই পূর্বাভাস দিয়ে গেল।

প্রতিবাদের আগুন ছোঁয়া মিছিল ধর্মতলার মেট্রো চ্যানেল অভিমুখে। আলোকচিত্র ঃ বাবলু

‘‘আজকের দেশব্রতী’’
বিশেষ সংখ্যা
প্রকাশিত হবে কলকাতা বইমেলার সময়

সম্পাদকীয়

নয়া দুর্নীতির রকমসকম

ত্রিফলা আলো লাগানোর প্রকল্প রূপায়ণে বড়মাপের আর্থিক দুর্নীতি ঘটে চলার বিষয়টি কেবল কলকাতা মহানগরীর মধ্যে সীমিত নেই, তা ফাঁস হয়ে যাচ্ছে সুদূর উত্তরবঙ্গেও। এস জি ডি এ (শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ)-র তত্ত্বাবধানে ঐ দুই পুরসভার মাধ্যমে দুই শহরে যে ত্রিফলা রোপণ কর্মযজ্ঞ এযাবত চলেছে তাতে ইতিমধ্যেই ধরা পড়েছে দুর্নীতির পাহাড়। কোটি কোটি টাকার নয়ছয় চলেছে। কলকাতার মতই এস জি ডি এ-র ক্ষেত্রে দুর্নীতির অস্তিত্ব প্রাথমিকভাবে ধরা পড়েছে বিভাগীয় তদন্তে। পুরসভার মাথায় থাকা সর্বোচ্চ কুঠুরী, প্রকল্প প্রণয়ণের যারা কর্তাব্যক্তি, তারা ঠ্যালায় পড়ে অগত্যা দুর্নীতির প্রশ্নজড়িত আর্থিক হিসাব পরীক্ষার ব্যাপারে সম্মত হয়েছেন।

কলকাতা পুরসভার ক্ষেত্রে তো তৃণমূলী মেয়রসাহেব প্রথমে দুর্নীতির কোনও অভিযোগ শুনতেই চাননি, 'ক্যাগ'-এর মাধ্যমে হিসাব পরীক্ষার বাপারে প্রচন্ড গররাজী ছিলেন। তাঁর শরীরী ভাষা ছিল এরকম যে, কলকাতা পুরসভা যেন তৃণমূলের সম্পত্তি! তিনি মনে করেছিলেন, ত্রিফলা সজ্জায়ন যেহেতু রাজ্য সরকারের মহানগরীর লন্ডনকরণের প্রকল্পের অঙ্গীভূত, আর তিনিও ম্যাডাম মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ 'স্নেহধন্য'দের অন্যতম, তাই তাঁকে নিশ্চিত পুরোদস্তুর রক্ষাকত্রী হিসেবে পেয়ে যাবেন। মুখ্যমন্ত্রীও প্রথমত সেই অপচেষ্টা চালিয়েছিলেন, সেই উদ্দেশ্যে দুর্নীতির অভিযোগ তোলার পেছনে তৃণমূল পুরসভার বিরুদ্ধে 'অপপ্রচার-চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র' ইত্যাদি ভূত দেখাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যখন দেখলেন অভিযোগের সামাজিক প্রভাব ছড়াচ্ছে চারিদিকে এবং পুরসভা ও সরকারের ভাবমূর্তি এমন নতুন এক প্রশ্নের সম্মুখীন, যা সামাল দেওয়া যাচ্ছে না, তখন মুখ্যমন্ত্রী 'ক্যাগ'-এর হিসাব পরীক্ষার আপীল মেনে নিতে সংকেত দিতে বাধ্য হলেন। মেয়রের সুরও পাল্টে যায়। 'ক্যাগ'-এর হিসাব পরীক্ষার তথ্য যতটুকু যা খবরে মিলছে তাতে সন্দেহ আরও গভীরই হচ্ছে। কলকাতা পুরসভার দুর্নীতি শুধুমাত্র ত্রিফলা আলো লাগানোর কারবারে সীমিত নেই, দুর্নীতির খবর প্রকাশ হচ্ছে নিকাশী প্রকল্পের ক্ষেত্রে, আই পি এল ক্রিকেট প্রতিযোগিতা চ্যাম্পিয়ান 'কে কে আর' টীমকে পুরসভার খরচে মুখ্যমন্ত্রীর তরফে সোনার চেন উপহার দেওয়ার ক্ষেত্রেও। শেষোক্ত 'কীর্তি'টি শুধু দুর্নীতির অপরাধে অভিযুক্ত করলে শেষ হয়ে যায় না, এটা সম্পূর্ণ নীতি গর্হিত ব্যয়জনিত অপরাধ হিসেবেই সাব্যস্ত হওয়া উচিত, কারণ কে কে আর কলকাতার পরিচিতি বহনকারি হলেও (কলকাতা পুরসভার নয়) এক বেসরকারি মালিকানাধীন টীম যার পেছনে পুরসভারপুরষ্কার-অর্থ খরচ করার ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়েছে স্বেচ্ছাচারিভাবেই।

কলকাতার পরপর উত্তরবঙ্গেও যে দুর্নীতির বেলুন ফেটেছে সেখানেও ধরা পড়েছে একই অনিয়মগুলো গোপনে চালিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। কলকাতার মতন উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রেও ঐ বাতিস্তম্ভ লাগানোর পরিকল্পনা তীব্র গতিতে সম্পন্ন করার নির্দেশ ছিল স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীরই। এই স্বীকারোক্তি প্রশ্নবাণে জেরবার হয়ে করে ফেলেছেন এস জি ডি এ-র তৃণমূলী চেয়ারম্যান। এখন কলকাতা ও উত্তরবঙ্গে ত্রিফলা বাতি দুর্নীতি ধরা পড়ে যাওয়ায় স্বাভাবিকভাবে দাবি উঠে আসে আরও যে সমস্ত জেলায় এই আলোকায়ন যজ্ঞ চলেছে সেখানে আগাম বিশেষ হিসাব পরীক্ষা শুরু করা হবে না কেন?

তৃণমূল আমলে দুর্নীতি কেবল পুরসভায় সীমিত থাকছে না, পঞ্চায়েতেও যেখানে যেখানে যে যে স্তরে তৃণমূল ক্ষমতায় রয়েছে তার প্রায় সর্বত্রই দুর্নীতির অভিযোগ বাড়ছে। পঞ্চায়েতে এমনকি বহু ক্ষেত্রে যেখানে বিরোধীরা ক্ষমতায় রয়েছেন সেরকম অবস্থাতেও তৃণমূলের লোকেরা সন্ত্রাসমূলক আচরণের মাধ্যমে ক্ষমতা কার্যত অবৈধভাবে কব্জা করে সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের টাকাকড়ি জোরজবরদস্তি হাতিয়ে নিয়ে দুর্নীতির ও বেআইনী জমি আত্মসাৎ-এর কারবার চালাচ্ছে। তার প্রমাণগুলো একের পর এক ধরা পড়ছে যেমন লোবা থেকে বড়জোড়ায়।

পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাসীন তৃণমূল যখন ক্রমবর্ধমান দুর্নীতির অভিযোগের সম্মুখীন, তখন পাশাপাশি সংবাদজগতে খবর ছড়াচ্ছে দ্বিতীয় ইউ পি এ জমানায় তৃণমূল মন্ত্রীদের সময়কার রেলমন্ত্রকের দুর্নীতির খবর! এ মন্তব্য নাকি কেন্দ্রীয় ভিজিলেন্স কমিশনের। এখন এসব নিয়ে নিজেকে কলংকমুক্ত করার বল তৃণমূলের কোর্টে। বিধানসভা ও লোকসভার ভেতরে ও বাইরে বিভিন্ন ফোরামে খোলামেলা বিতর্কে অংশ নেওয়ার সততা তৃণমূল দেখাতে পারছে না কেন?

ধর্ষণ বিরোধী কনভেনশন কান্দীতে, মিছিল বালীতে

২৪ ডিসেম্বর আইসার মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটি এবং আইপোয়ার যৌথ উদ্যোগে কান্দীতে নারী নিগ্রহ বিরোধী একটি প্রতিবাদী কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। সূচনায় গণসঙ্গীত পরিবেশন করেন মালেক সেখ ও ছাত্র নেতা সৌনক। প্রাবন্ধিক ও সাংস্কৃতিক কর্মী শঙ্খ গুপ্ত সমাজের মহিলাদের ওপর নেমে আসা অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় হামলা সম্পর্কে বিস্তারিত বলেন। সি পি আই (এম এল) মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির সদস্য জুল মুখার্জী মহিলাদের ওপর আক্রমণকে সামগ্রিকভাবে প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যক্ত করেন। বিশেষ করে মুর্শিদাবাদের প্রান্তিক গ্রামগুলোতে মুসলিম মহিলাদের সামাজিক দুর্দশা, তালাক প্রথা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, উত্তরাধিকার আইন ইত্যাদি প্রসঙ্গে বলেন। শ্রমের সাথে যুক্ত মহিলাদের ওপর পুঁজিবাদী আক্রমণের কথাও বক্তব্যে উঠে আসে। আইপোয়ার রাজ্য নেত্রী চন্দ্রাস্মিতা চৌধুরী সারা দেশে এবং এই রাজ্যে মহিলাদের ওপরে নেমে আসা সামাজিক আক্রমণ ও সে বিষয়ে মহিলাদের সংগঠিতভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন। বিশিষ্ট আইনজীবী রাজীবলোচন রায় মহিলাদের ওপর নেমে আসা একের পর এক আক্রমণ এবং তদসম্পর্কিত সরকারি আইনের আমলাতান্ত্রিকতা নিয়ে বিস্তারিত বলেন। সমগ্র কনভেনশন পরিচালনা করেন ছাত্র নেতা অরিত্র গোস্বামী। চিত্রশিল্পী অনুপম রায়ের এ বিষয়ে অসাধারণ কিছু চিত্র প্রদর্শিত হয়। শতাধিক মানুষ বিশেষত গ্রামীণ শ্রমজীবী মহিলাদের উপস্থিতি কনভেনশনকে সাফল্যমণ্ডিত করে। ঐ দিন সি পি আই (এম এল) আহ্বান দিয়েছিল দেশের প্রধান প্রধান কেন্দ্রগুলোতে ধিক্কার দিবস পালনের, সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে কনভেনশনের শেষে ছাত্র-যুব-মহিলাদের লাল পতাকা ও পোস্টারে সুসজ্জিত ধিক্কার মিছিল কান্দি বাসস্ট্যাণ্ড পরিক্রমা করে।

দিল্লীর গণধর্ষণের ঘটনা ও দেশের সর্বত্র বেড়ে চলা নারী নির্যাতনে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের উদাসীনতার বিরুদ্ধে ২৫ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় বালী আঞ্চলিক কমিটি এক ধিক্কার মিছিল সংগঠিত করে। হাতে মোমবাতি ও সমবেত কণ্ঠে প্রতিবাদী সঙ্গীত সহ এই দৃপ্ত মিছিল পথচলতি মানুষ, দোকান-বাজার থেকে বেরিয়ে আসা মানুষ ও বাসযাত্রীদের মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং এলাকার মধ্যে ভালো প্রভাব ফেলে। মিছিলের সামনে ছিলেন মোহন হালদার, মনোরঞ্জন ব্যানার্জী, তপন ঘোষ, রঘুপতি গাঙ্গুলী, দীপঙ্কর মুখার্জী সহ পার্টির বর্ষীয়ান সদস্যরা।

মদের বাড়বাড়ন্ত ঘটানোর নীতীশ কুমারের উদ্যোগের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছে বিহার

বিষমদে মৃত্যু বিহারে গণহত্যার সাম্প্রতিক মাধ্যম রূপে দেখা দিয়েছে। যাঁরা মারা যাচ্ছেন তাঁরা অবধারিতভাবেই গ্রাম ও শহরের মেহনতি মানুষ, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার যাঁদের 'মহাদলিত' অ্যাখ্যা দিয়ে তাদের সমর্থন আদায় করার চেষ্টা করছেন। সহজেই বোঝা যাচ্ছে, বিষমদে একের পর এক মৃত্যুর ঘটনা বিহারে ব্যাপক ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে এবং মদের ওপর নিষেধাজ্ঞার দাবিতে সি পি আই (এম এল)-এর ডাকে ১৫ ডিসেম্বর বিহার বন্ধ পালিত হয়েছে। ১৯৭৪-এর আন্দোলনের পর এটাই সম্ভবত প্রথমবার যখন মদ মাফিয়াদের বিরুদ্ধে আন্দোলন রাজ্যে জনগণের আন্দোলনের রাজনৈতিক এজেণ্ডার প্রথম সারিতে চলে এসেছে।

বিষমদে মৃত্যু হঠাৎই কোন ব্যতিক্রমী ঘটনা হয়ে দেখা দিয়েছে এমন নয়, আর ঐ মৃত্যুগুলো শুধু ''অবৈধ'' মদ থেকেই ঘটছে না। সেদিন গয়ায় হতভাগ্য যে মানুষগুলোর মৃত্যু ঘটল তারা মৃত্যুর ঠিকানা লেখা মদ সরকারি লাইসেন্স পাওয়া দোকান থেকেই কিনেছিল। নীতীশ কুমারের 'সুশাসন'-এর সরকারি ছাপ মারা মদের প্যাকেটই মৃত্যুগুলোকে ডেকে এনেছিল। সর্বশেষ সরকারি হিসেব অনুযায়ি বিহারে ৫৬২৪টা লাইসেন্সপ্রাপ্ত মদের দোকানের বিশাল জাল রয়েছে। আজ বিহারে প্রায় প্রতিটি পঞ্চায়েতেই একটা করে লাইসেন্সপ্রাপ্ত মদের দোকান রয়েছে আর এটাও কোন গোপন ব্যাপার নয় যে প্রতিটি লাইসেন্সপ্রাপ্ত দোকানের সঙ্গে দুটো করে লাইসেন্সহীন দোকানও রয়েছে। সরকারি দাবির বিপরীতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত দোকানের জালের সম্প্রসারণ অবৈধ জালটাকে কমিয়ে আনতে বা তাকে বৈধ করে তুলতে পারেনি; দুটোই পাশাপাশি বেড়ে উঠেছে এবং বৈধটা হয়ে উঠেছে অবৈধের সদর।

মদের দোকানের জালের দ্রুত সম্প্রসারণ নীতীশ কুমারের 'সুশাসন'-এর অর্থনীতি ও রাজনীতির কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে উঠেছে। সরকার মদ থেকে পাওয়া রাজস্বের ক্রমেই বেড়ে চলার কথা গর্বের সঙ্গে বলে থাকে—যে রাজস্ব ২০০৫-০৬-এর মাত্র ৩২৯ কোটি থেকে বেড়ে ২০১১-১২-তে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ২০৪৫ কোটিতে। ছ-বছরে রাজস্ব যদি ছ-গুণ বেড়ে গিয়ে থাকে তবে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি যে মদের কারবারিদের লাভে কি পরিমাণ উল্লম্ফন ঘটেছে। নিরপেক্ষ যে কোন তদন্তই পর্দার আড়ালে থাকা আবগারি শুল্কে বিশাল কেলেঙ্কারিকে উন্মোচিত করবে। আমাদের সবারই মনে আছে নীতীশ কুমার কিভাবে ২০১০-এর ফেব্রুয়ারিতে আবগারি মন্ত্রী জামশেদ আশরফকে সরাসরি বরখাস্ত করেন, তাঁর অপরাধ ছিল তিনি তাঁর দপ্তরে ৫০০ কোটি টাকার কেলেঙ্কারির তদন্ত করত চেয়েছিলেন।

বিহার যখন বিষমদে শতাধিক হতভাগ্য মানুষের মৃত্যুতে শোকাচ্ছন্ন, নীতীশ কুমারের তখন এটা বলতে একটুও বাধছে না যে, ছাত্রীদের স্কুলের পোশাক বা সাইকেল দেওয়ার মত তাঁর সাধের জনমোহিনী প্রকল্পগুলোর টাকা মদের ক্রমবর্ধমান উৎপাদন ও বিক্রি থেকেই আসতে পারে। যথেষ্ট জোরের সাথে এটাও কি বলা যায় না যে, মদ থেকে আসা রাজস্বকে তাঁর সরকারের আত্মস্তুতির বিজ্ঞাপনে এবং স্বীয় গৌরব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাঁর অপচয়মূলক যাত্রাগুলোতেও ব্যবহার করা হচ্ছে?

বিহারে এটা সুবিদিত যে, মদ মাফিয়াই নতুন সরকারের অন্যতম প্রধান খুঁটি হয়ে উঠেছে। বস্তুত, আগেকার কুখ্যাত অপহরণ ব্যবসার সামন্ততান্ত্রিক-কুলাক চাঁইরা এখন প্রমোটারি, নির্মাণ ঠিকাদারি ও মদের ব্যবসায় বড় আকারে নেমেছে। নীতীশ কুমারের উন্নয়ন বীক্ষা শুধু রাজ্যের মদ মাফিয়াদের মধ্যেই আটকে নেই; বিজয় মাল্যর মতন মদের মহাকারবারিরাও বিহারে তাদের জালকে ছড়াচ্ছে। নীতীশ কুমারের মনস্কামনা পূর্ণ হলে বিহারের চিনি কলগুলো অ্যালকোহল ও জৈব-জ্বালানির কারখানায় পরিণত হবে। জনগণের প্রবল ক্ষোভের মুখে পড়ে নীতীশ কুমার এখন মদ মাফিয়াদের বিরুদ্ধে অনেক কিছু বলছেন এবং কপটতার চরম প্রকাশ ঘটিয়ে তাঁর সরকার ২৬ নভেম্বর 'নিষিদ্ধ দিবস' পালন করে, যেটি ছিল নীতীশ কুমার সরকারের দ্বিতীয়বারের শপথের দিন!

মদের প্রণালীবদ্ধ বিস্তার নারীদের বিরুদ্ধে হিংসার ভয়াবহ বৃদ্ধি এবং অপরাধ ও সামাজিক উৎপীড়নের নতুন করে বাড়বাড়ন্তের পিছনে অন্যতম মূল কারণ হয়ে থাকছে। বিহারের তরুণীরা যথার্থভাবেই বলছেন যে, মদ বিক্রির রাজস্ব থেকেই যদি সাইকেল প্রদানের অর্থ আসে তবে তাঁদের ঐ সাইকেলের দরকার নেই। মদকে বাড়িয়ে চলার নীতীশ কুমারের তাড়নার সামাজিক মূল্য দেওয়া বিহারের পক্ষে সম্ভব নয়, যে ঘটনাকে সবচেয়ে বেশি করে উপলব্ধি করছেন বিহারের নারীরা যাঁরাই মদ-বিরোধী প্রচারাভিযানের সামনের সারিতে থেকে লড়াই করছেন। যুবকদের এখন নারীদের সাথে হাত মিলিয়ে মদ মাফিয়াকে এবং মদের প্যাকেটে মৃত্যু বিলোনোর সরকারকে চ্যালেঞ্জ জানাতে হবে। বিহারে মদ-বিরোধী আন্দোলন ইতিমধ্যেই কমরেড ভাইয়ারাম যাদবের মত অনুকরণীয় দৃষ্টান্তকে সামনে এনেছে, যিনি ছিলেন সি পি আই (এম এল)-এর রোহতাস জেলার তরুণ সম্পাদক। মদ মাফিয়ার মোকাবিলা করা এবং নারীদের মর্যাদার সুরক্ষায় দাঁড়ানোর জন্য এ বছরের গোড়ার দিকে যাঁকে হত্যা করা হয়। বিহারের লড়াকু যুবক ও নারীদের সমবেত শক্তি মদ মাফিয়া ও তাদের রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকদের অবশ্যই পরাস্ত করতে পারবে।

(এম এল আপডেট সম্পাদকীয়, ১৮ ডিসেম্বর ২০১২)

জগদ্দল জুটমিলে গেট সভা

২১ ডিসেম্বর জগদ্দল জুট মিলে বি সি এম এফ-এর ইউনিট গঠন হওয়ার পর ইউনিয়নের নেতৃত্বে শ্রমিকরা ৫ সফা দাবি মিল কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিতে যায়। দাবি ছিল—(১) সিনিয়রিটি ভিত্তিক গ্র্যাচুইটি প্রদান ও কোটা প্রথা বাতিল করতে হবে, (২) সমস্ত শ্রমিককে পি এফ এবং ই এস আই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, (৩) পি এফ দৈনিক ২৫ টাকা কাটার পরিবর্তে মাসিক ৬৫০০ টাকার ভিত্তিতে কাটতে হবে, (৪) জিরো নাম্বার ও কর্মরত অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ৩০০ টাকা দিতে হবে, (৫) বি সি এম এফ ইউনিয়নকে কর্তৃপক্ষের স্বীকৃতি দিতে হবে।

শ্রমিকরা দাবিসনদ পেশ করলেও মিল কর্তৃপক্ষ তা নিতে অস্বীকার করে। এর প্রতিবাদে ২২ ডিসেম্বর মিল গেটে বিক্ষোভ সভা করা হয়। ঐ সভায় শ্রমিকদের উপস্থিতি ছিল পাঁচ শতাধিক। শ্রমিক জমায়েতের চেহারা কারখানা চত্বর ছাড়িয়ে রাস্তা অবরোধে পরিণত হয়ে যায়। বক্তব্য রাখেন মিলের ইউনিয়ন সম্পাদক কমরেড ওমপ্রকাশ রাজভর, রাজ্য সম্পাদকদ্বয় মাজাহার খান ও বটকৃষ্ণ দাস ও সভাপতি নবেন্দু দাশগুপ্ত। সভা পরিচালনা করেন কমরেড শাহ আলম।

সি পি আই (এম এল) নবম কংগ্রেসের খসড়া প্রতিবেদন (১)

মহিলা আন্দোলন—চ্যালেঞ্জ ও কর্তব্যসমূহ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মহিলা, কাজ এবং পুরুষতন্ত্র

১৭। আর্থিক উদারীকরণ বেশি বেশি সংখ্যায় মহিলাদের কর্মক্ষেত্রে টেনে আনছে—যদিও কাজের এই ক্ষেত্রগুলো বিপদের সম্ভাবনায় ভরা ও নিরাপত্তা বিহীন। এই সমস্ত ক্ষেত্রে শোষণ নিছকই 'আর্থিক' চরিত্রের নয়—এই শোষণের ক্ষেত্রে লিঙ্গ একটা গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। উদাহরণস্বরূপ, তামিলনাড়ুতে কম বয়সী মহিলা বস্ত্র শ্রমিকদের অত্যন্ত অগণতান্ত্রিক ও শোষণের পরিবেশে কাজ করতে বাধ্য করা হয়, আর এটা সম্ভব হয় সুমঙ্গলী প্রকল্পের কারণে, যে প্রকল্প কুমারী মেয়েদের পণের টাকা নিজেদেরই জোগাড় করার লক্ষ্যে রচিত হয়েছে আর যা কম বয়সী মেয়েদের বিবাহ ও পণ সম্পর্কিত গভীর সামাজিক উদ্বেগকে কাজে লাগায়। কেন্দ্রীয় সরকারের আশা, মিড-ডে-মিল ও অঙ্গনওয়াড়ি প্রকল্পগুলোও মহিলাদের পরিবার ও সমাজের প্রতি বিনা পারিশ্রমিকে ও নিঃস্বার্থ সেবার পুরুষতান্ত্রিক ধারণাকেই কাজে লাগায় এবং তাঁদের পূর্ণ বেতন ও সরকারি কর্মীদের সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদানের পরিবর্তে কিছু 'সম্মান দক্ষিণাকেই' যুক্তিযুক্ত করে তোলে।

১৮। শ্রমশক্তি হিসেবে মহিলাদের আবির্ভাবের সাথে সাথেই তাঁদের কর্মস্থলে লিঙ্গ বৈষম্যের মুখোমুখি হতে হয়। একই কাজে পুরুষদের তুলনায় মহিলারা আজও কম মজুরি ভোগ করেন। তাঁদের বৈষম্যমূলক নিয়ম-বিধির মুখে পড়তে হয় (যেমন পোশাক-বিধি আরোপ, চেহারা/দর্শনে লিঙ্গ বিষয়ক রীতি বজায় রাখা ইত্যাদি)। এমনকি সম্মানজনক ও বেশি বেতনের কাজেও লিঙ্গ বৈষম্য যথেষ্টই দেখা যায়। এয়ার ইণ্ডিয়ায় ফ্লাইট সুপারভাইজার পদে নিয়োগের জন্য দীর্ঘ আইনি লড়াই চালিয়ে সম্প্রতি মহিলা কেবিন কর্মীরা জয় অর্জন করেছেন। সেনাবাহিনীতে অদ্যাবধি মহিলারা অফিসার পদে নিয়োগের সুযোগ পাননি কেননা মহিলাদের কাছ হতে আদেশ আসাটা জওয়ানদের প্রত্যাশিত নয়। দর্শনে মানানসই হওয়া সম্পর্কে নিপীড়নমূলক রীতি সাধারণভাবে মহিলাদের প্রতি বৈষম্যমূলক, তবে এটি বিশেষত দলিত ও আদিবাসী মহিলাদের ক্ষেত্রে বেশি বৈষম্যপূর্ণ। কিছুদিন আগেও মহারাষ্ট্রে কেবিন কর্মী হিসেবে প্রশিক্ষিত আদিবাসী মহিলাদের আকর্ষণীয় চেহারা নেই বিচারে বিমান পরিষেবার কাজে নিযুক্তিকে খারিজ করা হত।

১৯। বাড়িতে এবং পরিবারের মধ্যে মহিলাদের শ্রমকে এখনও 'অদৃশ্য' করে রাখা হয়েছে। শ্রমের এই চরিত্রকে মহিলাদের 'স্বাভাবিক' বা 'প্রাথমিক' ভূমিকা বলে বর্ণনা করে মতাদর্শগত ছদ্মবেশের আড়ালে রাখা হয়েছে। এমনকি জনগণনার সমীক্ষাতেও ''রান্না করা, বাসন মাজা, শিশুর পরিচর্যা, জল আনা, কাঠ সংগ্রহের'' কাজে যুক্ত মহিলাদের অনুৎপাদক অ-শ্রমিক বলে বিবেচনা করা হয়েছে। একইসঙ্গে বাড়ির মধ্যে মহিলাদের শ্রমদানকে সমাজে তাঁদের 'প্রাথমিক' দায়িত্ব বলে অভিহিত করার মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রেও মহিলাদের কম পারিশ্রমিক দেওয়ার অজুহাত তৈরি করা হয়—মহিলাদের শ্রমকে পুরুষ কর্তৃক অর্জিত আয়ের নেহাৎ 'সম্পূরক' হিসেবে দেখানোর যুক্তি খাড়া করা হয়। নয়া উদারবাদী নীতিসমূহ ও ফলশ্রুতিতে সামাজিক দায়িত্বসমূহ যথা শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা ও বাস্তু পরিচ্ছন্নতা থেকে রাষ্ট্রের হাত গুটিয়ে নেওয়ার পরিণামে মহিলাদের গৃহস্থালী ও গোষ্ঠীজীবনের কাজে বিনা পারিশ্রমিকে বেশি বোঝা বহন করতে হচ্ছে।

২০। গৃহস্থালীয় কাজকে 'অ-শ্রম' শ্রেণীভুক্ত দেখানোকে সুপ্রীম কোর্ট সমালোচনা করায় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক সরকার কর্তৃক গৃহকর্মের আর্থিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে গৃহবধূদের স্বামী কর্তৃক পারিশ্রমিক/সাম্মানিক প্রদানের সুপারিশ করেছে। এই সুপারিশ একেবারেই বেমানান ও ত্রুটিপূর্ণ। এটা ঘটনা, বাড়িতে মহিলাদের বিনা পারিশ্রমিকে শ্রমদান শ্রমিকদের কম মজুরি প্রদানের সহায়ক হিসেবে পুঁজিবাদকেই সুবিধা করে দেয়। বাড়ির কাজের জন্য স্বামীদের অর্থ প্রদানের কোনো যুক্তি নেই কারণ এই অর্থ/বেতন প্রদান গৃহস্থের আয়ে বাড়তি কোনো সংযোগ ঘটায় না। এছাড়া, স্বামী কর্তৃক এই ধরনের অর্থ/বেতন প্রদান শ্রমের লিঙ্গভিত্তিক বিভাজনকেই যুক্তিগ্রাহ্য করে তোলে এবং স্বামীকে গৃহকর্মে অংশ নেওয়ার দায় থেকে অব্যাহতি দেয়। এতে বাড়ির মধ্যে আর্থিক প্রশ্নে নিয়ন্ত্রণের অসমতাকেও যুক্তিগ্রাহ্য করে তোলা হয়, সামগ্রিকভাবে গৃহস্থালীর আর্থিক ব্যাপারে সমনিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে মহিলাদের অধিকারকে নাকচ করা হয় এবং পরিবর্তে মহিলাদের কিছু 'সম্মানিক' প্রাপ্তিরই কেবল অধিকার রয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে। পরিবারের মধ্যে মহিলাদের গার্হস্থ শ্রমের সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বীকৃতি তখনই অর্থবহ হতে পারে যখন তাঁদের অকিঞ্চিৎকর কঠিন একঘেয়ে কাজগুলো থেকে মুক্তির পথ সুগম হয়। এটা তখনই হতে পারে যখন রাষ্ট্র শিশু এবং বৃদ্ধদের বিনাব্যয়ে সেবার ভার বহনে, নিখরচায় স্বাস্থ্য পরিষেবা ও মহিলাদের কর্মসংস্থান সমেত অন্যান্য সামাজিক সহায়তা প্রদানে এগিয়ে আসে।

২১। বিশ্বায়নের কল্যাণে 'শ্রমের প্রমীলাকরণ' নিয়ে অনেক হৈচৈ শোনা যায়। কিন্তু মহিলাদের 'আর্থিক অংশগ্রহণ ও সুযোগ-সুবিধা বিষয়ক' প্রশ্নে সাম্প্রতিক এক আন্তর্জাতিক সমীক্ষায় ১৩৪টি দেশের মধ্যে ভারতকে ১৩১তম স্থানে রাখা হয়েছে। ১৫ বছরের ঊর্ধ্বে এদেশে মাত্র ৩৫ শতাংশ মহিলা অর্থনৈতিক কার্যকলাপে যুক্ত, যেখানে এ প্রশ্নে পুরুষের সংখ্যা ৮৫ শতাংশ। মহিলাদের মধ্যে বেকারত্বের হার খুবই বেশি, অনেক ক্ষেত্রেই তা পুরুষদের বেকারত্বের হারের থেকেও বেশি। দৃষ্টান্তস্বরূপ, এন এস এস ও-র ৬১তম রাউণ্ডের হিসাব অনুযায়ী ২০-২৪ বছর বয়সীদের মধ্যে গ্রামাঞ্চলে ২০০৪-০৫ সালে পুরুষদের মধ্যে বেকারত্বের হার (কর্মপ্রার্থী, কিন্তু এখনও কাজ পায়নি) ছিল ১২ শতাংশ আর মহিলাদের মধ্যে এই হার ছিল ১৫ শতাংশ, আর শহরে পুরুষদের ক্ষেত্রে এই হার ছিল ১৬ শতাংশ আর মহিলাদের মধ্যে ছিল ২৭ শতাংশ।

২২। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবশ্য মহিলা শ্রমকেই পছন্দ করা হয় কারণ তাঁদের 'পরিপূরক' শ্রমিক হিসেবে বিবেচনা করে কম মজুরি দেওয়া চলে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে কাজে পুরুষতান্ত্রিক ধারণায় মহিলাদেরই সেই কাজের উপযুক্ত বলে বোধ হয়। এ কারণে মহিলাদের অপ্রচলিত ক্ষেত্রগুলোকে—যেখানে 'থ্রি ডি' (ডার্টি, ডেঞ্জারাস, ডিমিনিং (নোংরা, বিপজ্জনক ও নীচু শ্রেণীর)) চরিত্রের কাজ করানো হয়—অসম অনুপাতে কাজে লাগানো হয়। কখনও কখনও মহিলাদের এই কারণেও পছন্দ করা হয় কারণ তাঁরা সহজে ইউনিয়নে আবদ্ধ হতে পারেন না বা লড়াইয়েও নামতে পারেন না ধরে নিয়ে (বিপরীতটা ঘটার নজির থাকা সত্ত্বেও) এবং অসম লিঙ্গ সম্পর্কের কারণে তাঁদের ওপর বলপ্রয়োগ করাটা অনেক সহজ।

২৩। সরকার থেকে 'মহিলাদের ক্ষমতায়নের' প্রধান বাহন হিসেবে স্বনিযুক্তি গোষ্ঠীগুলোকে (এস এইচ জি) তুলে ধরা হয়। কিন্তু মাইক্রো ফিনান্সের (এম এফ আই) প্রতিষ্ঠানগুলোও শোষণ চালায় এবং পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোগুলোকেই মজবুত করে তোলে, মহিলাদের 'ভালো ঋণগ্রহীতা' হিসেবে দেখা হয় কারণ তাঁরা চট করে অন্যত্র চলে যেতে পারেন না এবং সামাজিকভাবে তাঁদের ওপর বেশি জোর খাটানো যায়। এম এফ আই-গুলো মহিলাদের ক্ষমতায়নের পরিবর্তে তাঁদের বরং ঋণ-ফাঁদেই আবদ্ধ করেছে। এম এফ আই-গুলোর শোষণমূলক সুদের হার এবং ঋণ শোধে অক্ষমতার জন্য অপমানের যে বহর তার ফলে ঋণ শুধতে মহিলাদের পতিতাবৃত্তিতে নামতে হয় এবং (এজন্য) সম্প্রতি অন্ধ্রপ্রদেশে ৫০ জনেরও বেশি মহিলাকে আত্মহত্যা করতে হয়েছে। মহিলারা পুরুষদের তুলনায় ব্যাঙ্কে যাওয়া বা অন্য প্রাতিষ্ঠানিক ঋণদান সংস্থায় যাওয়ার সুযোগ কমই পান। এক্ষেত্রে তাঁদের সুযোগকে প্রশস্ত করার বদলে সরকার মহিলাদের কেবল মাইক্রো ক্রেডিট (ক্ষুদ্র ঋণ) নির্ভর করতে চাইছে। কিন্তু মাইক্রো ক্রেডিট মহিলাদের মহাজনী ঋণের শোষণ থেকে নিষ্কৃতি দিতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রেই এম এফ আই-গুলোর মাধ্যমে পাওয়া ঋণ শোধ করতে মহিলাদের মহাজনদের কাছ থেকেই টাকা ধার করতে হয়। ব্যাঙ্ক ও কর্পোরেটগুলোও গ্রামীণ দরিদ্র মহিলাদের শোষণ ও মুনাফার দুনিয়াজোড়া জালে টেনে আনার জন্য এম এফ আই-গুলোকে বেশি বেশি করে কাজে লাগাচ্ছে।

২৪। বিশ্বজোড়া অর্থনৈতিক সংকট ভারতের মতো উন্নয়নশীল এশীয় দেশগুলোর বিশেষত মহিলাদের কর্মসংস্থান ও জীবনযাপনের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। এর কারণ যে সমস্ত ক্ষেত্রগুলো এই সংকটের দ্বারা ভয়ানকভাবে আক্রান্ত সে সমস্ত ক্ষেত্রের কাজেই মহিলাদের অংশগ্রহণ বেশি। এই ক্ষেত্রগুলো হল ঃ বস্ত্রশিল্প, পোশাক, জুতো ও চর্মজাত দ্রব্য, বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম, হোটেল, রেস্টুরেন্ট ও নির্মাণ শিল্প। ২০০৮-এ বিশ্বজুড়ে যখন আর্থিক সংকট নেমে আসে তখন ভারতে বস্ত্র ও পোশাক শিল্পে নিয়োজিত ৭,০০,০০০ কর্মী কাজ হারান, যাদের অধিকাংশই ছিলেন মহিলা।

২৫। খুচরো ব্যবসায় কর্পোরেটদের আগমনের ফলেও মহিলা শ্রমিকদের কর্মসংস্থান ধাক্কা খেয়েছে। অন্যান্য ক্ষেত্রে কাজ না পাওয়ায় মহিলারা সাধারণত সামান্য খুচরো ব্যবসার শরণাপন্ন হন (যেমন ছোট দোকান কিংবা রাস্তায় ফেরি করে বিক্রির কাজ)। কিন্তু বড় বড় কর্পোরেট ওস্তাদরা এই ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করা ও অপ্রথাগত ফেরিওয়ালাদের উচ্ছেদ করাটা নগরোন্নয়নের নীতি হয়ে দাঁড়ানোর ফলে এই ক্ষেত্রে মহিলাদের কর্মসংস্থানের হার নিদারুণভাবে হ্রাস পেয়েছে। বহু ব্রাণ্ডের খুচরো ব্যবসায় প্রত্যক্ষ বিদেশী পুঁজি (এফ ডি আই) ঢুকলে নিশ্চিতভাবেই এই ক্ষেত্রে মহিলারা আরও চাপের মুখে পড়বেন।

২৬। বিশ্বায়নের ফলে ভারতে নারী পাচারের ব্যবসা আরও সহজতর হয়েছে। ভালোবাসার অছিলায় কিংবা কাজের লোভ দেখিয়ে দেশের অভ্যন্তরে এবং বিদেশেও প্রলুব্ধ করে নারী পাচারের ঘটনা বড় আকার নিয়েছে। গায়ের জোরে, চুরি করে এনে ও হিংসাত্মক উপায়ে ভারতে বহুসংখ্যায় মহিলাকে যৌনব্যবসায় নামানো হয়েছে। দাসত্বের এক রূপ হিসেবে কিছু কিছু নিপীড়িত জাতের মহিলাদের যৌনব্যবসায় নামতে বাধ্য করা হচ্ছে। দেবদাসী প্রথার মাধ্যমে এই যৌন দাসত্বকে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো উৎসাহিত করছে। নিরাপদ ও উপযুক্ত মজুরিতে কাজের অভাবে বেঁচে থাকার জন্য অনেক মহিলা যৌনবৃত্তি বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছেন। যতদিন পর্যন্ত দরিদ্র মহিলারা নিরাপদ ও উপযুক্ত পারিশ্রমিকের কাজ থেকে বঞ্চিত থাকবেন ততদিনই তাঁদের অনেকে এই শোষণমূলক ও বিপজ্জনক যৌনব্যবসার আশ্রয় নিতে বাধ্য হবেন। জাতিগত ও ধর্মীয় পরম্পরার নামে এই ধরনের নারী পাচার ও যৌন দাসত্বের অবসান ঘটানোর জন্য আমাদের অবশ্যই সংগ্রাম চালাতে হবে। যৌনকর্মীদের জোরজুলুম, শোষণ, অত্যাচার ও হয়রানির থেকে রক্ষা করার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে, যৌনকর্মী ও তাঁদের ওপর নির্ভরশীলদের সামাজিক পরিষেবা ও পূর্ণ নাগরিকত্বের দাবি তুলতে হবে, সাথে সাথে মহিলাদের নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ কাজের দাবিতে সংগ্রাম চালাতে হবে যাতে তাঁদের বাধ্য হয়ে যৌনব্যবসায় নামার পরিস্থিতিকে রোধ করা যায়।

রাজনৈতিক জগতে বৈষম্য সৃষ্টি

২৭। সংসদ ও বিধানসভাগুলোতে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব আজও অত্যন্ত অল্প। রাজনৈতিক ফায়দা তোলার এক উপায় হিসেবে নারী-স্বাধীনতা এবং তাঁদের উত্থানের বিষয়ে আতঙ্ক ছড়ানো হচ্ছে। মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণের প্রশ্নটির তো শোচনীয় দশা। অনগ্রসর সম্প্রদায়ভুক্ত (ওবিসি) মহিলাদের সংরক্ষণের ধুয়ো তুলে বিলটির বিরোধিতা করা হচ্ছে। কিন্তু যত দিন গড়াচ্ছে সেই দাবিটিও পিছনের সারিতে চলে যাচ্ছে এবং বিলটির বিরুদ্ধাচরণকারীরা সংসদে মহিলাদের প্রবেশকে বাধা দিতে প্রকাশ্যেই লিঙ্গ-পক্ষপাতিত্বের সওয়াল করছে। শাসক ইউ পি এ জোট (পূর্ববর্তীতে এন ডি এ জোট) লিঙ্গ পক্ষপাতিত্বের শক্তিগুলোকে কালহরণ করা ও বিলটি পাশ হতে বাধা দেওয়াকে সাহায্য করার মারফত নিজেদের আসল চরিত্রকে উন্মোচিত করেছে। ওবিসি ও সংখ্যালঘুদের জন্য আসন (কোটা) সংরক্ষণের দাবি জানানোটা কোনোমতেই বিলটিকে স্থগিত রাখা বা লঘু করে দেওয়ার অজুহাত হতে পারে না। বিলটি পাশ হওয়ার বিন্দুমাত্র বিলম্ব না ঘটিয়ে বরং মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণের পরিধির মধ্যেই এই দাবিটিকেও অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া যেতে পারে।

২৮। পঞ্চায়েতগুলোতে মহিলাদের জন্য ৫০ শতাংশ আসন সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং নির্বাচিত মহিলা প্রতিনিধিরা পুরুষতান্ত্রিক শক্তিগুলোর চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করছেন। এতদসত্ত্বেও নির্বাচিত মহিলা প্রতিনিধিদের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ অব্যাহত আছে, উদাহরণস্বরূপ, 'পঞ্চ পতি' বন্দোবস্তের মাধ্যমে নির্বাচিত মহিলার হয়ে তাঁর স্বামীই সবকিছু নির্বাহ করছে এবং জাত-পাত ও লিঙ্গ ভেদাভেদের নানা পদ্ধতি চালু থাকছে। রাজনীতি ও নাগরিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে—পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে সংসদ থেকে গণআন্দোলন পর্যন্ত—মহিলাদের বিরোধিদের কাছ থেকে যৌনবাদী ও লিঙ্গভিত্তিক কুৎসার মুখে পড়তে হচ্ছে।

২৯। সংসদ ও পঞ্চায়েতকে ছাড়িয়ে রাজনীতির অঙ্গনে মহিলাদের প্রাণবন্ত ও শক্তিশালী অংশগ্রহণ এবং জাগরণ সংরক্ষণকে প্রতীকী স্তরেই সীমাবদ্ধ না রাখার জন্য খুবই জরুরি। মহিলাদের প্রয়োজন ও আকাঙ্খা মেটানোর উপযোগী পরিবেশ গড়ে তোলার জন্যও এটা খুব প্রয়োজন।

মহিলা আন্দোলন এবং উদারীকরণ ঃ কিছু উদ্বেগের বিষয়

৩০। উদারীকরণ মহিলা আন্দোলনের সামনে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ হাজির করেছে এবং আন্দোলনের ভেতর বেশ কিছু অস্বস্তিকর প্রবণতার জন্ম দিয়েছে। মহিলাদের গোষ্ঠীগুলোর ব্যাপক এনজিও-করণ এবং এইসব গোষ্ঠীগুলোতে সরকার এবং নানা অর্থ যোগানদার সংস্থার টাকা ঢালার যা বহর তাতে মহিলা আন্দোলনের স্বাধীনসত্তা দারুণভাবে সঙ্কুচিত হচ্ছে। সরকারগুলো অনেক ক্ষেত্রেই তাদের দায়িত্ব এনজিও-গুলোর হাতে পাচার করে দেওয়াটাকে যুক্তিগ্রাহ্য করে তুলতে সফল হয়েছে। নীতি প্রস্তুত ও রূপায়নে এন জি ও-গুলোকে সামিল করে নেওয়াটাকে 'অংশীদারমূলক উন্নয়ন' বলে প্রচার করা হচ্ছে। বিষয়ভিত্তিক সংগঠনের নামে প্রকল্পভিত্তিক অর্থবরাদ্দ মহিলাদের সংগঠনকে খণ্ডবিখণ্ড হওয়ার দিকে চালিত করছে এবং গোষ্ঠীগুলোতে যারা অর্থ জোগাচ্ছে তাদেরই গ্রুপের অ্যাজেণ্ডা স্থির করার সুযোগ করে দিচ্ছে। মহিলাদের গোষ্ঠীগুলোকে রাষ্ট্র ও উদার অর্থনৈতিক নীতিমালার মোকাবিলা করার সামর্থ্যকে অর্থ জোগানো এবং এনজিও-করণের মাধ্যমে সীমাবদ্ধ ও নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে।

চারের পাতায় দেখুন

মহিলা আন্দোলন ...

তিনের পাতার পর

স্বাধীন নাগরিকের অধিকাররূপে মহিলাদের অধিকার

৩১। ভারতীয় রাষ্ট্র মহিলাদের তাঁদের স্বীয় অধিকারেই নাগরিক হিসেবে বিবেচনা করার পরিবর্তে তাঁদের পরিবারগত ও সন্তান উৎপাদনের ভূমিকাতেই দেখে থাকে। মহিলাদের অবিচ্ছেদ্য অধিকারগুলো রক্ষায় তার যে দায়িত্ব আছে তাকে স্বীকার করার পরিবর্তে রাষ্ট্র মহিলাদের প্রতি পিতৃতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীই পোষণ করে। রাজ্য সরকারগুলো যখন 'গণ বিবাহ' কিংবা 'বালিকাদের জন্য বিবাহ প্রকল্প' পরিচালনা করে তখন এই প্রবণতাই পরিলক্ষিত হয়। এইসব প্রকল্পের মাধ্যমে রাষ্ট্র মহিলাদের বিবাহের বিষয়টিকে বাবা-মায়ের দায়িত্ব বলেই দেখে থাকে এবং বিবাহের ক্ষেত্রে মেয়েদের নিজস্ব পছন্দের অধিকারকে খারিজ করে দেয়। মহিলারা যাতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাধিকার অর্জন করতে পারেন সেই লক্ষ্যে নীতি প্রবর্তনের পরিবর্তে এই সমস্ত প্রকল্পগুলো বিবাহকে বাবা-মা বা গোষ্ঠীর তরফে সরকার কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠান বা বন্দোবস্ত বলে মনে করে, মহিলাদের নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা বলে মনে করে। অন্যান্য আরও যে সমস্ত প্রকল্প (যেমন দিল্লী সরকারের ল্যাডলি প্রকল্প) সেগুলোর লোকদেখানো উদ্দেশ্য হল বালিকারা যখন সাবালকত্ব অর্জন করবে তখন তার জন্য কিছু নগদ অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দান। মেয়ের বিবাহের বয়স হলে তাকে নগদ কিছু দিয়ে সাহায্য করার মাধ্যমে সরকার আসলে ঘুরপথে পণের টাকারই কিছুটা ভর্তুকি হিসেবে বহন করল!

৩২। নাগরিক হিসেবে একপ্রস্থ অধিকারের দাবিতে মহিলাদের সংগ্রাম চালাতে হবে ঃ গণবণ্টন ব্যবস্থায় রেশনের জন্য, শিক্ষার দাবিতে ও স্বাস্থ্যের জন্য। যদিও পৈত্রিক সম্পত্তিতে মহিলাদের অধিকার আইনগতভাবে স্বীকৃত হয়েছে মহিলারা কিন্তু দীর্ঘকালীন আইনি লড়াই ব্যতিরেকে তাদের এই ন্যায্য অংশের দখল পেতে কদাচিৎ সক্ষম হন, আর এই আইনি লড়াই খুব কম মহিলাই লড়তে পারেন। গ্রামাঞ্চলে মহিলারা বাস্তু জমির জন্য সংগ্রামে সবিশেষ সক্রিয় কেননা মালিকের যে জমিতে তাঁরা বাস করেন সেখানে আধা-দাসত্বের বন্ধনে তাঁদেরই সবথেকে কষ্ট ভোগ করতে হয়। শহরাঞ্চলেও মহিলারা আবাসনের দাবিতে, উচ্ছেদ ও কর্পোরেট জমি লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে খুবই সক্রিয়। তাঁরা মূল্যবৃদ্ধি এবং পারমাণবিক ও অন্যান্য পরিবেশ ধ্বংসকারী প্রকল্পের বিরুদ্ধে সংগ্রামেও সক্রিয়। এই সমস্ত সংগ্রামে মহিলাদের অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করার পাশাপাশি আমাদের অবশ্যই তরুণী মহিলাদের সেই সমস্ত দাবিতে সমাবেশিত করার জন্য জোর দিতে হবে যে সমস্ত দাবিগুলো শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও স্বাস্থ্য পরিষেবায় নিশ্চিত অধিকারের জন্য মহিলাদের কাছে মুখ্য বিষয় হয়ে রয়েছে (উদাহরণস্বরূপ, ছাত্রী ও কর্মরত মহিলাদের জন্য হস্টেল, সংগঠিত ও অসংগঠিত ক্ষেত্রের মহিলাদের জন্য ক্রেশের সুযোগ, বিদ্যালয়ে বালিকাদের বিনা বেতনে পড়াশোনা ও বইপত্র, ল্যাপটপ ও সাইকেলের জন্য সাহায্য, মাতৃত্বকালীন দীর্ঘ ছুটি, মহিলাদের জন্য দক্ষতাপূর্ণ চিকিৎসা-বিধি সম্পন্ন যথোপযুক্ত ও কার্যকরী সুসজ্জিত প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং জেলা ও মহকুমা স্তরের হাসপাতালগুলোতে যথেষ্ট শয্যাবিশিষ্ট মহিলা ওয়ার্ড)।

৩৩। বহু রাজ্যে মহিলারা মদ-বিরোধী আন্দোলনের সামনের সারিতে থেকেছেন (অন্ধ্রপ্রদেশ ও উত্তরাখণ্ড এবং খুব সম্প্রতি বিহার এক্ষেত্রে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য)। পুরুষদের মদ্যপানে আসক্তি দরিদ্র মহিলাদের জীবনে প্রভূত দুর্দশা সৃষ্টি করে ঃ সামান্য আয়টুকু মদের পিছনে উজাড় হয়ে যায়, বিষাক্ত বেআইনি মদ জীবন কেড়ে নেয় এবং মহিলা ও শিশুদের ওপর পারিবারিক নির্যাতন ঘটিয়ে চলে। এই সমস্ত আন্দোলনে মহিলা ও তাদের পরিবারের স্বাচ্ছন্দ্যের স্থলে সরকার রাজস্ব আদায়ের মতলবে মদের কারবার বৃদ্ধির যে নীতি নিয়েছে মহিলারা তাকেই আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করেছেন।

৩৪। একটি আন্তর্জাতিক সমীক্ষায় দেখানো হয়েছে, মহিলাদের স্বাস্থ্য ও জীবনকালের নিরীখে ভারতের অবস্থান প্রায় সর্বনিম্নে (১৩৫টি দেশের মধ্যে ১৩৪তম)। ভারতে মায়েদের মৃত্যুর হার বিশ্বের মধ্যে সবথেকে ভয়ঙ্কর, এখানে গর্ভবতী মায়েদের ৫৭.৯ শতাংশ এবং বিবাহিত মহিলাদের ৫৬.২ শতাংশ রক্তাল্পতায় ভোগেন। স্পষ্টতই বিষয়টি ভারতীয় মহিলাদের দারিদ্র, দীর্ঘ অপুষ্টি ও লিঙ্গভিত্তিক প্রতিকূলতার দিকে ইঙ্গিত করে।

৩৫। প্রায়শই বিদেশী অর্থে পুষ্ট পরিবার পরিকল্পনা, বন্ধ্যাকরণ অভিযান ইত্যাদির নামে মহিলাদের লক্ষ্যবস্তু বানানো হয় এবং তাঁদের শরীরে ঝুঁকির সৃষ্টি করা হয়। সম্প্রতি বিহারে, যুক্তরাজ্যের ডি এফ আই ডি-র টাকায় মহিলাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে তড়িঘড়ি বন্ধ্যাকরণের জন্য অসংখ্য অস্ত্রোপচার করা হয়েছে যার পরিণতিতে বহু মহিলা মারা গেছেন ও অনেকে অপুষ্টির শিকার হয়েছেন।

৩৬। সরকার এবং ওষুধ কোম্পানিগুলো ডেপো-প্রভেরা ও নেট-এন-এর মতো ইঞ্জেকশন ব্যবহারে যেভাবে প্ররোচনা দিচ্ছে তার ফলে মহিলাদের স্বাস্থ্যকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে। ভারতের দরিদ্র মহিলাদের নানা চিকিৎসা সংক্রান্ত গবেষণায় গিনিপিগের মতো ব্যবহার করা হচ্ছে এবং বিশেষ করে সহজে কব্জা করা যায় এমন দরিদ্র ও দলিত/আদিবাসী পরিবারের মহিলাদের ওপর আগে থেকে সম্মতি না নিয়ে ভ্যাকসিন গবেষণা বা ডাক্তারি পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হচ্ছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, অন্ধ্রপ্রদেশ ও গুজরাটে ১০-১৪ বছর বয়সী আদিবাসী বালিকাদের ওপর হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস (এইচ পি ভি) রোধক ইঞ্জেকশনের পরীক্ষামূলক প্রয়োগ ঘটানোর ফলে ৭ জনের মৃত্যু ঘটেছে।

৩৭। বিপজ্জনকভাবে ভারত হয়ে উঠেছে বাণিজ্যিকভাবে সারোগেট মাতৃত্বের গন্তব্যস্থল—যেখানে ধনী ভারতীয় ও বিদেশী পরিবারের দম্পতিরা দরিদ্র ভারতীয় মহিলাদের গর্ভ ভাড়া নিচ্ছেন। কমিশন প্রদানের শর্তে এই সব দম্পতিরা ফর্সা ও 'উঁচু' জাতের সারোগেট মা চাইছেন। এইসব সারোগেট মায়েদের জীবন ও স্বাস্থ্যের ভয়ানক ঝুঁকি নিতে হচ্ছে এবং তাঁদের দারিদ্র ও অসহায় অবস্থাকে এই ধরনের শিল্প কাজে লাগিয়ে নিচ্ছে। মহিলা গ্রুপগুলোকে সঙ্গে নিয়ে এই ধরনের অনুশীলনের নৈতিকতা ঘিরে ব্যাপক বিতর্ক চালানো ও তার ফয়সালা না হওয়া অবধি সারোগেট মাতৃত্বকে স্থগিত রাখার পরিবর্তে সরকার বরং এই অনুশীলনকে মদত দিচ্ছে এবং এটিকে আইনসিদ্ধ ও 'নিয়ন্ত্রণের' জন্য বিল আনার উদ্যোগ নিচ্ছে।

৩৮। অধিকার এবং সম্মানের জন্য ও বৈষম্যের প্রতিবাদে সমকামী, হিজরে ও যৌন সংখ্যালঘুদের সংগ্রামও সাম্প্রতিক সময়ে মাথাচাড়া দিয়েছে। সমকামীতাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য না করার জন্য ২০০৯-এ দিল্লী হাইকোর্টের ঐতিহাসিক রায় দান সত্ত্বেও সমলিঙ্গের সম্পর্ক স্থাপন বিষয়ে বৈষম্যমূলক যে ৩৭৭ ধারা তার বিলোপ সাধনের জন্য সরকার কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না। ৩৭৭ ধারাকে বাতিল করা গেলে আরও সুরক্ষা, সম্মান ও মর্যাদার দাবি অর্জনে এই সমস্ত স্তরের মানুষদের (লেসবিয়ান, গে, উভলিঙ্গ, লিঙ্গান্তরিত ও হিজরে সমেত নানা শাখা) সামনে পথ খুলে যাবে।

৩৯। মহিলা সংগ্রামের চাপে রাজ্য ও জাতীয় স্তরে মহিলা কমিশনগুলো গড়ে উঠেছে। কিন্তু রাজনৈতিক নিয়োগের আধিক্য এবং অর্থ, হাত-পা ও ক্ষমতা বাঁধা থাকার কারণে কমিশনগুলো উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে সক্ষম নয়। জাতীয় মহিলা কমিশন ও রাজ্য মহিলা কমিশনগুলোকে বিধিবদ্ধ ক্ষমতা প্রদান ও রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার বদলে মহিলা আন্দোলনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এবং মহিলা সংগঠনগুলোর সাথে আলোচনা সাপেক্ষে এই সমস্ত মহিলা কমিশনের প্রধান ও অন্যান্য সদস্যদের নির্বাচন করাটা জরুরি। মহিলা কমিশনগুলোর উচিত মহিলা আন্দোলনের প্রতি দায়বদ্ধ হওয়া। মহিলা সংগঠনগুলোর কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণের জন্য নিয়মিতভাবে তাদের সাথে মহিলা কমিশনগুলোর আলোচনা সভা আয়োজন করা প্রয়োজন।

পার্টি ও মহিলা সংগঠনের উদ্যোগ

৪০। গ্রাম ও শহরের দরিদ্রদের ওপর প্রধান ভিত্তিকে রেখে নিপীড়ন, বৈষম্য ও অবমাননার বিরুদ্ধে এবং সমানাধিকার, স্বাধীনতা ও মর্যাদার দাবিতে সংগ্রাম চালানোই ঐতিহাসিকভাবে আমাদের পার্টি ও মহিলা সংগঠনের মূল বিষয় হয়ে থেকেছে। এই আন্দোলনে সামন্ত অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে হাজার হাজার দরিদ্র কৃষক ও মেহনতি মহিলাদের (অধিকাংশই অত্যাচারিত জাত থেকে আসা) সমাবেশিত করা হয়েছে এবং আন্দোলনের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যকে ধরে রেখে সামন্ত-কুলাক শক্তির কাঠামোগুলোর ওপর আঘাত হানা হয়েছে। ভারতে মহিলা আন্দোলনগুলোর মধ্যে এটাই (আমাদের) পার্থক্য সৃষ্টিকারী গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এবং এই গুরুত্বকে আমাদের ধরে রাখতে হবে ও আরও বিকশিত করতে হবে।

৪১। আজও সব ধরনের হিংসা ও শোষণের বিরুদ্ধে গ্রাম-শহরে কৃষক ও শ্রমিকশ্রেণীর মহিলাদের সংগ্রাম গড়ে তোলাই অ্যাপোয়ার মুখ্য বিষয় হয়ে থাকছে। অ্যাপোয়া অবশ্য রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও পুলিশ হেফাজতে অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামেও সোচ্চার হয়েছে বিশেষ করে আফস্পা ও অপারেশন গ্রীণ হান্টের বিরুদ্ধে সে সোচ্চার থেকেছে। একইসঙ্গে এম এন আর ই জি এ এবং কৃষিশ্রমিক মহিলাদের সমান মজুরি ও মর্যাদার দাবিতে সংগ্রামেও সে সম্মুখ সারিতে থেকেছে।

৪২। সম্প্রতি বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে অ্যাপোয়ার হস্তক্ষেপ রাজনৈতিকভাবে নির্ণায়ক বলে প্রমাণিত হয়েছে। এর তাৎপর্যপূর্ণ উদাহরণ হল বিহারে রূপম পাঠক মামলা—যেখানে জে ডি (ইউ)-বিজেপি সরকার, শাসকশ্রেণীর বিরোধীপক্ষ ও সংবাদমাধ্যম এক বিজেপি বিধায়ককে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত স্কুল শিক্ষিকার বিরুদ্ধে প্রবল পুরুষতান্ত্রিক কুৎসা রটনায় প্রথমদিকে একাকার হয়ে গিয়েছিল। অ্যাপোয়ার সাহসী ও সময়োচিত হস্তক্ষেপে এই তথ্য প্রকাশ হয়ে যায় যে ঐ বিধায়ক ও তার ব্যক্তিগত সহায়কের বিরুদ্ধে রূপম আগেই অভিযোগ দায়ের করেছিলেন এবং পুলিশ সে বিষয়ে কোনো পদক্ষেপই গ্রহণ করেনি। অতিদ্রুত অ্যাপোয়া রূপম পাঠকের প্রতি ন্যায় বিচারের দাবিতে এবং কলঙ্কিত ঐ বিধায়কের পক্ষে দাঁড়ানো বিহার সরকারের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের পুরুষতান্ত্রিক প্রচারের বিরুদ্ধে জনমতকে জয় করে আনতে সক্ষম হয়। রূপম পাঠককে কারাদণ্ড দেওয়ার মধ্য দিয়ে সি বি আই এবং বিচার বিভাগের পুরুষতান্ত্রিক প্রবণতা উন্মোচিত হয়ে গেছে এবং রূপম পাঠকের প্রতি সুবচারের দাবিতে আন্দোলন অব্যাহত আছে। অতি সম্প্রতি গয়ার (বিহার) এক স্কুলছাত্রীকে সামন্ত লুম্পেনদের দ্বারা গণধর্ষণের বিরুদ্ধে পার্টি ও অ্যাপোয়ার নেতৃত্বে পরিচালিত সংগ্রামের ওপর পুলিশ গুলি চালায় ও সাংঘাতিক দমন নামিয়ে আনে। রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ও যৌন অত্যাচারের মতো বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করে যে যে বড় ঘটনার পরিণাম হিসেবে রাজ্যজোড়া বন্ধ আছড়ে পড়ে তার মধ্যে এই সংগ্রাম ছিল অন্যতম।

৪৩। কারখানার মহিলা শ্রমিক, চা-বাগিচা শ্রমিক, নির্মাণ কর্মী, বিড়ি মজদুর, ব্যাঙ্ক ও অফিস-কর্মচারী ইত্যাদি হল আমাদের সাধারণ ট্রেড ইউনিয়ন ভিত্তির বড় উপাদান। এদের মধ্যে যেখানে সম্ভব সেখানেই মহিলা সংগঠনের এক গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভিত্তি গড়ে তোলার জন্য নিয়মিত কাজ চালানো উচিত। সংশ্লিষ্ট ট্রেড ইউনিয়নগুলোর সাথে সমন্বয় রেখেই এই ধরনের কাজ চালানো যেতে পারে—ঠিক যেমনটি আয়ালা এবং এ আই কে এম-এর স্থানীয় ইউনিটগুলোর সঙ্গে সমন্বয় রেখে গ্রামীণ দরিদ্রদের মধ্যে কাজ চালানো হয়ে থাকে।

৪৪। শ্রমজীবী মহিলাদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে অ্যাপোয়া সরাসরি ভূমিকা নিয়ে থাকে এমন ক্ষেত্রও আছে। যেমন জুগ্গি ঝুপড়িতে বসবাসকারীদের মধ্যে—শহুরে গণভিত্তির মধ্যে এখানকার মহিলারাই সর্বপ্রধান। কয়েকটি নগর ও শহরে পারিবারিক/গার্হস্থ শ্রমিকদের মধ্যেও অ্যাপোয়ার কমরেডরা স্থানীয়ভিত্তিতে সংগঠন গড়ে তুলেছেন।

৪৫। গ্রামীণ অর্থনীতির দ্রুত বৈচিত্র ঘটার কল্যাণে গরিব ও মধ্যকৃষক পরিবার থেকে বড় সংখ্যক মহিলা বিভিন্ন পেশায় যুক্ত হচ্ছেন। তাদের মধ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হল সাম্মানিক ও ইনসেন্টিভ-এর ভিত্তিতে কর্মরত শ্রমিক—জাতীয় স্তরে যাদের সংখ্যা ৩০ লক্ষ—যা আরও বেড়ে চলেছে। স্থায়ী কাজ ক্যাজুয়াল প্রথায় করানো, কম মজুরির কাজকে চরম শোষণমূলক মহিলাকেন্দ্রীক করে তোলা এবং এমনকি ন্যূনতম মজুরি দিতেও অস্বীকার করা ইত্যাদি ধরনের নয়া উদারবাদী শ্রমনীতির যাঁরা শিকার, যাঁদের শতকরা একশভাগ সরকারী প্রকল্পে কাজ করা সত্ত্বেও সরকারী কর্মচারীর মর্যাদা পাওয়াটা সুদূরপরাহত, তাঁরা অর্থনৈতিক ন্যায় ও মর্যাদার দাবিতে সংগঠিত হওয়া ও সংগ্রাম করার জন্য গভীর আগ্রহ প্রকাশ করছেন। কৃষক পরিবারের সদস্য হওয়ার কারণে কৃষক সমাজের জীবন ও সংগ্রামের সাথে তাঁদের যেমন জীবন্ত সম্পর্ক বজায় থাকে তেমনি তাঁরা শ্রমিক হিসেবে আর্থিক বঞ্চনার বিরুদ্ধে ও মহিলা হিসেবে যে অবমাননা ও হয়রানি—তার বিরুদ্ধেও সংগ্রামে সক্রিয়।

৪৬। শ্রেণী ও লিঙ্গ বৈচিত্রের ও আশা-আকাঙ্খার বাস্তব জীবনের আন্তঃসম্মিলনের ফলে খুব স্বাভাবিকভাবেই এই ক্ষেত্রে কাজের প্রশংসনীয় বিস্তার ঘটাতে ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র ও মহিলা সংগঠন—উভয়েই অবদান রেখেছেন। এদিক থেকে আমাদের প্রধান সাফল্য আশা ইউনিয়নগুলোর এক সর্বভারতীয় ফেডারেশন গঠন। এই ফেডারেশন ২০১১-র সেপ্টেম্বরে জাতীয় রাজধানীতে সাড়া জাগানো এক ধর্ণা সংগঠিত করেছে। যেহেতু প্রধান দাবিগুলো কেন্দ্রীয় সরকারের, কিছু কিছু রাজ্য সরকারের কাছ থেকে আদায় করতে হবে সে কারণে ফেডারেশনকে তার সহধর্মীদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দক্ষ হয়ে উঠতে হবে এবং স্থানীয় অস্তিত্বকে ছাপিয়ে উঠে ও দ্রুত বিস্তার ঘটিয়ে দাবি অর্জনে সমর্থ হতে হবে। রাজ্য এবং জেলাভিত্তিতে মিড-ডে মিল রন্ধনকর্মীদের সংগঠনও গড়ে তোলা গেছে। উত্তরপ্রদেশে অ্যাপোয়া দেওয়ারিতে জেলা স্তরে মিড-ডে-মিল রন্ধনকর্মীদের সংগঠিত করেছে ও তাদের কর্মচ্যুত করার জন্য যে অপচেষ্টা তা রোধ করার জন্য জেলাশাসকের সমক্ষে সফল সংগ্রাম পরিচালনা করা গেছে। এই ধরনের সংগঠন ও সংগ্রামকে ব্যাপক পরিধিতে গড়ে তোলার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

৪৭। মহিলা সংগঠনের কর্মীরা যখন শ্রমজীবী মহিলাদের প্রধানত তাদের জরুরি অর্থনৈতিক দাবিতে সংগঠিত করছেন তাঁরা মহিলা আন্দোলনের উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে অর্থনৈতিক সংগ্রাম বা অর্থনীতিবাদে আটকে পড়ছেন না। বিপরীতে, তাঁরা অ্যাপোয়াকে তার স্বাধীন জমি, বিকাশমান, গতিশীল জমি তৈরি করে দিচ্ছেন—যা যথাযথ দিশা পেলে ব্যাপক মহিলা আন্দোলনের বাহিনী সৃষ্টি করতে পারে। বাস্তবত মহিলা শ্রমিকদের মধ্যে কর্মরত ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের তুলনায় অ্যাপোয়া কর্মীরা মহিলাদের সমস্যাকেন্দ্রিক বিষয়গুলোকে আরও ভালোভাবে বোঝা ও উদ্যোগ নেওয়ার উপযোগী বলে সংগ্রাম গড়ে তোলায়

পাঁচের পাতায় দেখুন

মহিলা আন্দোলন ...

চারের পাতার পর

অপেক্ষাকৃত বেশি সফল হতে পারেন। সুতরাং এই চলমান, সামাজিকভাবে গতিশীল, আপেক্ষিকভাবে শিক্ষিত (যেমন আশা ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী) ও শ্রমজীবী মহিলাদের জঙ্গী অংশের মধ্যে নিহিত বিপুল শক্তিকে কাজে লাগানোর জন্য এই অনুশীলনকে আরও পরিকল্পিতভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করতে হবে। স্বভাবতই এজন্য প্রয়োজন গভীর রাজনৈতিক উপলব্ধি ও মহিলা সংগঠন এবং ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের মধ্যে সাংগঠনিক সমন্বয় সাধন।

৪৮। ব্যাপকভিত্তিক মহিলা আন্দোলনের জন্য কলেজের ছাত্রী ও অধ্যাপিকাদের মধ্যে, সাংবাদিক মহিলা ও সাধারণভাবে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে আমাদের কাজের সীমানাকে বিস্তৃত করা অত্যন্ত প্রয়োজন। আমাদের মতো সংগঠনের কাছে যার প্রধান সামাজিক ভিত্তি সাধারণভাবে গ্রামীণ দরিদ্রদের মধ্যে—এটা সত্যিই এক চ্যালেঞ্জ। এই উদ্দেশ্যে আমাদের হিন্দি, ইংরেজি, অসমিয়া ও বাংলায় প্রকাশিত পত্রিকাগুলোকে ভালাভাবে কাজে লাগানো দরকার।

৪৯। এই সমস্ত শ্রেণী ও স্তরগুলো ছাড়াও অপর একটি ক্ষেত্রও আমাদের গভীর মনোযোগ দাবি করে। এটি হল পঞ্চায়েতে আমাদের মহিলা জনপ্রতিনিধি। তৃণমূল স্তরে রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে সক্রিয় এই প্রতিনিধিরা আমাদের জনগণের কাছে পৌঁছাতে এবং জনগণের কাছ থেকে মতামত পেতে চমৎকার মাধ্যম হতে পারেন। মহিলারা যেসব সমস্যার প্রায়ই মুখোমুখি হন সেগুলো নিয়ে আলোচনার জন্য মহিলা সংগঠন গ্রামস্তরে সভা করতে পারে। পানীয় জল, স্বাস্থ্য পরিষেবা তার সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক বিষয় যেমন ৫০ শতাংশ সংরক্ষণ হলে মহিলা প্রতিনিধিদের প্রত্যাশিত ও প্রকৃত ভূমিকা কী হবে—সেগুলো আলোচনার বিষয়বস্তু হতে পারে। নির্বাচনের পরে, মহিলা সংগঠন মহিলা প্রতিনিধিদের ঘরমুখী ঐতিহ্য ও জাত-পাত ও লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে, পুরুষ অভিভাবক ছাড়া স্বাধীনভাবে কাজ করার এবং জনগণের সাধারণ দাবিগুলোর মধ্যে মহিলাদের দাবিগুলোকে জোরের সঙ্গে উত্থাপনের ক্ষেত্রে মহিলা প্রতিনিধিদের উৎসাহিত ও সহায়তা দিতে পারে।

৫০। পার্টি দীর্ঘদিন ধরেই মহিলা পার্টি সদস্যদের সংখ্যা যথেষ্টভাবে বৃদ্ধি করা ও তাদের মতাদর্শগত-রাজনৈতিক মানোন্নয়ন ঘটানোর মাধ্যমে মহিলা কর্মী ও নেত্রী সংখ্যা বৃদ্ধির প্রশ্নে সবিশেষ চিন্তিত। বিভিন্ন সাংগঠনিক ও শিক্ষামূলক পদক্ষেপের মাধ্যমে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা জারি রাখতে হবে। পুরুষতান্ত্রিকতা বিরোধী সংগ্রামে কমিউনিস্ট পার্টি হিসেবে (শুধু আমাদের মহিলা সংগঠন নয়) আমাদের অধিকতর জোর দেওয়া প্রয়োজন। আমাদের অবশ্যই এটাও মনে রাখতে হবে, পুরুষতন্ত্র ঘেঁষা সাধারণ বোধগুলো সমাজে বদ্ধমূল হয়ে আছে—সুতরাং এর প্রভাব আমাদের সাধারণ কর্মীবাহিনী, এমনকি নেতৃত্বের মধ্যেও বর্তমান। অতএব, আমাদের রাজনৈতিক অনুশীলনে নিরন্তর ও নির্মম অন্তর্দৃষ্টি ও সচেতন প্রয়াসের প্রয়োজন যাতে পুরুষতান্ত্রিক মতাদর্শ ও অনুশীলনকে আমরা বিশ্লেষণ করতে পারি ও কাটিয়ে ওঠার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পারি। কেবলমাত্র তখনই আমরা পুরুষতান্ত্র বিরোধী প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক ভাবনায় প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিতে পারি এবং সেগুলোকে এক বাস্তব শক্তিতে পরিণত করতে পারি যা আমাদের সমগ্র আন্দোলন ও গোটা সমাজকে সতেজ করতে সক্ষম।

(সমাপ্ত)

সারা ভারতে ব্যাঙ্ক শিল্পে ২০ ডিসেম্বরের ধর্মঘট

সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে গৃহীত আরও দুটি কালা সিদ্ধান্ত দেশের অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে আরও সঙ্কটাপন্ন করে তুলবে। খুচরো ব্যবসায় প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগের সীমা ৫১ শতাংশ পর্যন্ত অনুমোদন এবং ব্যাঙ্কিং রেগুলেশন এ্যামেণ্ডমেন্ট বিল ২০১২-র মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং আইনের মৌলিক সংশোধন দেশের অভ্যন্তরে এবং বিদেশে ভারতের আর্থিক নীতির বড়সড় পরিবর্তন সূচীত করেছে। একই সাথে রাজনৈতিক বিন্যাসেও বড় ধরনের অদল বদল দেখা দিল। এফ ডি আই প্রশ্নে প্রায় সমস্ত বিরোধী দল একত্রিত থাকলেও সরকারের বিরুদ্ধে কার্যকরি পদক্ষেপের প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ বিরোধিতা টিকে থাকলো না। রাজ্য-রাজনীতির বাধ্যবাধকতার কারণে সংসদীয় তৃণমূল এবং বামেরা সরকারের প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপনে এক সঙ্গে দাঁড়াতে পারেনি, অন্যদিকে ব্যাঙ্কিং আইন সংস্কারের প্রশ্নে প্রধান বিরোধী দল সরকারের সঙ্গে দ্রুতই সহমত গড়ে তুলল। যার ফলে বাম সাংসদদের সংশোধনী এবং তৃণমূল সাংসদদের প্রবল চেঁচামেচি ব্যাঙ্ক সংস্কারের আইন প্রবর্তনে কোন বাধা তৈরী করতে পারলে না। ব্যাঙ্ক শিল্পের চারটি সংগঠন সারা ভারত ব্যাঙ্ক কর্মচারী সমিতি (এ আই বি ই এ), ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়া (বি ই এইচ), সারা ভারত ব্যাঙ্ক অফিসার্স এ্যাসোসিয়েশন (এ আই বি ও এ) এবং ন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ (এন ইউ বি ই) সম্মিলিতভাবে এই ধর্মঘটের ডাক দেয়। ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের সংগঠনসমূহের ঐক্যবদ্ধ ফোরাম ইউনাটেড ফোরাম অফ ব্যাঙ্ক ইউনিয়ন (ইউ এফ বি ইউ)-এর অন্য অংশ নেয়নি। যাদের সদস্য সংখ্যা প্রায় তিন লক্ষ। এঁদের বেতন কাটা যাবে না। একমাত্র ধর্মঘটি ব্যাঙ্ক কর্মচারীদেরই বেতন কেটে নেওয়া হয় ধর্মঘটের মাসে। এই ধর্মঘটে কর্মচারীদের মধ্যে বিভাজন থাকলেও একই ইস্যুতে ২১-২২ আগস্ট ব্যাঙ্কে দুদিন ধর্মঘট হয়েছিল। সে সময় সারা দেশে ১০ লক্ষ ব্যাঙ্ক কর্মচারী ধর্মঘটে সামিল হয়েছিলেন।

সংস্কারের প্রশ্নে

মনমোহন সরকার দ্রুত হাঁটতে চাইছে

৯০-এর দশকে নয়া উদারবাদী অর্থনীতির আমদানীর সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের প্রথমে কাঠামো পরিবর্তন এবং ধাপে ধাপে চরিত্র বদলের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। গ্রামীণ অর্থনীতি তথা গ্রামীণ মানুষের সঞ্চয়ে থাবা বাড়ানোর লক্ষ্যে প্রস্তাব করা হল লোকাল এরিয়া প্রাইভেট ব্যাঙ্কের। এরপর এসেছে নানাভাবে ব্যাঙ্কের সংযুক্তির পরিকল্পনা, পাশাপাশি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে সরকারি অংশীদারিত্ব কমানোর লক্ষ্যে বিলগ্নিকরণ তথা ব্যক্তি মালিকানায় সরকারি ব্যাঙ্কের শেয়ার তুলে দেওয়ার। মূলত কর্মচারীদের আন্দোলনের ফলেই এই সংস্কার প্রক্রিয়া বিলম্বিত হয়েছে। সংস্কারের বিলম্বের কারণে প্রধানমন্ত্রীর মার্কিন প্রভুরা যথেষ্ট ক্ষুব্ধ এবং আমেরিকার পত্রপত্রিকায় স্বল্পবাক ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে প্রায় নিকম্মা বলেই প্রকাশ করা হয়। বারাক ওবামাকে খুশী করতে ভারতীয় ভৃত্যরা দুটি উপহার দিল। খুচরো ব্যবসায় বিদেশী লগ্নি ও ব্যাঙ্কিং সংস্কার আইন। অন্যদিকে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের আন্দোলন এবং সংসদে তার প্রতিধ্বনি নতুন খাতে বইয়ে দিতে না পারার ফলে সংস্কারের ঘোড়াকে আপাতত প্রতিহত করা সম্ভব হল না।

ব্যাঙ্কিং আইনের সংস্কার আসলে

ঘুরপথে ব্যাঙ্ক বেসরকারিকরণ

ব্যাঙ্ক শিল্প সহ সমগ্র আর্থিক ব্যবস্থা রাষ্ট্রের হাতে রাখার পরিকল্পনা প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বে জাতীয় কংগ্রেসের মঞ্চে গৃহীত হয়েছিল। সে সময় কংগ্রেস সভাপতি ছিলেন সুভাষ চন্দ্র বসু। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে কর্মচারীদের দাবি এবং রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার ফলে ১৯৬৯ সাল প্রথমে ১৪টি পরে ১৯৮০ সালে আরও ৬টি ব্যাঙ্কের ১০০ শতাংশ মালিকানা সরকারের হাতে নিয়ে আসার আইন প্রণীত হয়। রাষ্ট্রায়ত্তকরণের সুফলের সিংহভাগ এসেছে বড় বড় শিল্পপতি এবং ধনিকদের হাতে, তবে বহু সাধারণ এবং স্বল্পবিত্তের মানুষও উপকৃত হয়েছে সন্দেহ নেই। শুধুমাত্র ব্যাঙ্কের শাখার সংখ্যা বিচারে দেখা যাবে, সরকার অধিগ্রহণের সময়ে ব্যাঙ্ক শাখা আট হাজার থেকে বর্তমানে সত্তর হাজারের আশেপাশে। ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণের সময়ের সাথে সাথে দেশের সাধারণ মানুষের অভ্যাস এবং সংস্থান পরিণত হয়েছে, তাই সরাসরি বেসরকারিকরণ যে কোন সরকারের পক্ষেই সহজ নয়। তাছাড়া সরকারি ব্যাঙ্ক সঞ্চয় মোট ব্যাঙ্ক আমানতের ৮০ শতাংশ। এই বিশাল আমানতে সরকার সহজেই হস্তক্ষেপ করতে পারে। নতুন সংস্কারে রাষ্ট্রায়ত্তকরণ আইনের ধারাও পরিবর্তন করে বেসরকারি বিনিয়োগ এবং ব্যাঙ্ক-বোর্ডে তার ভোট প্রদানের ক্ষমতা ১ শতাংশ থেকে ১০ শতাংশ করা হল।

বেসরকারি ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কিং রেগুলেশন ১২(২) ধারা সংশোধন করে বিদেশী বিনিয়োগ সংস্থাসমূহের ভোট প্রদানের ক্ষমতা ১০ থেকে বাড়িয়ে ২৬ শতাংশে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে ব্যাঙ্কগুলো যাতে নিজেদের প্রয়োজন মত (আসলে মন্ত্রীর নির্দেশে) নিজেরাই একে অপরের সঙ্গে মিশে যেতে পারে সেই লক্ষ্যে কম্পিটিশন কমিশনের আওতা থেকে ব্যাঙ্ক শিল্পকে বাইরে আনা হল। এর জন্য ব্যাঙ্কিং রেগুলেশন আইনে নতুন ধারা ২এ সংযোজন করা হয়েছে। এই আইনি সংশোধন/সংযোজনের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে সরকারি অংশিদারিত্ব কমানো এবং আরও বেশি করে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল হাউজকে ব্যাঙ্কিং লাইসেন্স প্রদানের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। ভারত সরকার ইতিমধ্যে ব্যাঙ্ক সংযুক্তির প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে সাতটি বড় ব্যাঙ্কের সঙ্গে অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলো জুড়ে দিয়েছে। সরকারি ভাষ্যে বলা হল, এই সংযোজন কৃৎ কৌশলগত আদান প্রদানের লক্ষ্যে চালিত; কিন্তু অর্থমন্ত্রীর মন্তব্য হল, এটা ব্যাঙ্ক মার্জারের (একীকরণের) প্রথম পদক্ষেপ। কে কার সঙ্গে মেলাবে-মিলিবে তার চিত্রটা এরকম—

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া	——	স্টেট ব্যাঙ্ক অফ হায়দ্রাবাদ, এস বি মাইশোর, এস বি বিকানির এ্যাণ্ড জয়পুর, এস বি ট্রাভাঙ্কোর
প্যাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক	——	দেনা ব্যাঙ্ক, বিজয়া ব্যাঙ্ক
ব্যাঙ্ক অব বরোদা	——	আই ডি বি আই, ইউকো ব্যাঙ্ক
ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া	——	ওরিয়েন্টাল ব্যাঙ্ক অফ কমার্স, অন্ধ্র ব্যাঙ্ক
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক	——	ইউ বি আই, পাঞ্জাব এ্যাণ্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক	——	ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র
কানাড়া ব্যাঙ্ক	——	ইণ্ডিয়ান ওভারসীজ, সিণ্ডিকেট ব্যাঙ্ক এবং কর্পোরেশন ব্যাঙ্ক

দেশের ব্যাঙ্ক শিল্পে মোট পুঁজির পরিমাণ ২০ হাজার কোটি টাকা এবং দেশের মানুষের মোট সঞ্চয় ১০০ লক্ষ কোটি টাকা। চিদাম্বরম আন্তর্জাতিক মানের বড় ব্যাঙ্ক বানাতে চান প্রতিযোগিতার জন্য। আসল অর্থ হল এই বিপুল অঙ্কের আমানত আন্তর্জাতিক প্রভুদের সহজলভ্য করে তোলা। ১২০ কোটির সরকারি হিসাবে ভারতবাসীর ৫০ শতাংশের কাছে এখনও ব্যাঙ্কিং পরিষেবা পৌঁছায়নি, তাই সেখানে ব্যাঙ্ক শাখার বিস্তার বেশী প্রয়োজন, সংযুক্তি নয়। এই ৫০ শতাংশের সঞ্চয়ে থাবা দিতে সরকারের পরিকল্পনা হল বিভিন্ন ঠিকাদারি ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে সাধারণ মানুষকে ব্যাঙ্কিং আওতায় নিয়ে আসা, যার গালভরা নাম 'ফিনান্সিয়াল ইনক্লুশন'। এখন দেশীয় ঠিকাদার থাকলে অদূর ভবিষ্যতে বিদেশী ঠিকাদার এখানে জায়গা করে নেবে।

এই ধর্মঘটে ব্যাঙ্ক কর্মচারিরা সারফেসি আইনের পরিবর্তনেরও বিরোধিতা করেছেন। দি সিকিউরিটাইজেশন এ্যাণ্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেট এ্যাণ্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইনটারেস্ট এ্যাক্ট ২০০২ আইনে ঋণখেলাপী ব্যক্তি/সংস্থার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতা ব্যাঙ্কের হাতে ছিল। বর্তমান আইন সংশোধনের ফলে ঐ অনাদায়ী ঋণ ঋণগ্রহীতার পুঁজিতে পরিণত হয়ে ব্যাঙ্কের লগ্নি হিসাবে থাকবে। যার নীট ফল ঋণ খেলাপীর ঋণদায় মুক্তি এবং ব্যাঙ্কের হাতে সেই শেয়ার যার বিনিময় সম্পদমূল্য শূন্য।

সারা দেশের তুলনায় আমাদের রাজ্যে ধর্মঘটের চেহারাটা ছিল ভিন্ন। অন্যান্য রাজ্যে ধর্মঘট এবং কাজে যোগদানে ইচ্ছুকদের মধ্যে বিরোধ বাধে। কাজে যেতে ইচ্ছুকদের প্রবল বাধার সম্মুখীন হতে হয়নি। এই রাজ্যে ব্যাঙ্কের দরজা বন্ধ করে ধর্মঘট পালিত হয়। এবারে সারা রাজ্যে প্রায় ৬ হাজার ব্যাঙ্ক শাখা এবং ৬০ হাজার কর্মচারি এবং বহু সংখ্যক এ টি এম—সবই ধর্মঘটে সামিল ছিল। ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাঙ্ক ইউনিয়নের অধীনে স্টেট ব্যাঙ্ক কর্মচারি এবং অফিসাররাও ধর্মঘটে নৈতিক সমর্থনে সামিল ছিলেন। স্টেট ব্যাঙ্কের পূর্বাঞ্চলীয় সদর দপ্তর ছাড়াও তিনটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের সদর দপ্তর এ রাজ্যে কলকাতা শহরে। কিছু আধিকারিক বাদ দিলে সর্বত্রই ছিল কর্মবিরতি। অতি অল্প সময়ের বিজ্ঞপ্তিতে একদিনে ১৯টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক, ১২টি বেসরকারি দেশীয় ব্যাঙ্ক এবং ৮টি বিদেশী ব্যাঙ্ক ধর্মঘটে সামিল হয়েছে। সারা দেশে ৭.৫ লক্ষ ক্লিয়ারিং চেক আটকে গেল। এতবড় একটি শক্তির উপযুক্ত প্রয়োগ এবং শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রতি সদিচ্ছা থাকলে আমাদের দেশের শ্রমিক আন্দোলন নয়া উদারবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রশ্নে ইউরোপের ভাইবোনদের সঙ্গে একই সারিতে থাকতে পারত। ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের আন্দোলন, বেশী মাত্রায় যাতে রাজনীতিকরণের দিকে না চলে যায় এবং অর্থনীতিবাদী আন্দোলনেই সীমাবদ্ধ থাকে এমন ভাবনার নেতাদেরও অভাব নেই।

- নির্মল ঘোষ

সি পি আই (এম এল)
কেন্দ্রীয় মুখপত্র (মাসিক)
"লিবারেশন"
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ১০০ টাকা

সি পি আই (এম এল) কেন্দ্রীয় কমিটি প্রকাশিত
হিন্দি কেন্দ্রীয় মুখপত্র (সাপ্তাহিক)
লোকযুদ্ধ
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ঃ ১৪০ টাকা

নয়া উদারবাদের সংকট ও গণআন্দোলনের সামনে চ্যালেঞ্জ

*(ইংরাজিতে **অরিন্দম সেন**-এর লেখা পুস্তিকার বাংলা অনুবাদ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। —সম্পাদকগুলী, দেশব্রতী)*

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

রেগান ও থ্যাচার শুরু করলেন নয়া উদারবাদী অভিযান

১৯৭০-এর দশকের সংকটের সময়ও কর্মসংস্থান ছাঁটাই, উচ্চ হারের মুদ্রস্ফীতি সত্ত্বেও মজুরিকে এক জায়গায় বেঁধে রাখা (যার অর্থ প্রকৃত মজুরি কমে যাওয়া) এবং অন্যান্য আক্রমণের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের বীরত্বপূর্ণ লড়াই করতে দেখা গেল। রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ মদতপুষ্ট সংগঠিত পুঁজিবাদী আক্রমণের মুখে তাঁরা তা দীর্ঘদিন চালিয়ে যেতে পারলেন না। নিচের রেখচিত্র থেকে এটা স্পষ্ট হবে, যেখানে ও ই সি ডি-ভুক্ত দেশগুলোতে ধর্মঘটের দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতাকে তুলে ধরা হয়েছে। এখানে শিল্পে নিযুক্ত প্রতি এক হাজার ধর্মঘটী শ্রমিকের মাপকাঠিতে ধর্মঘটের পরিসংখ্যান হাজির করা হয়েছে।

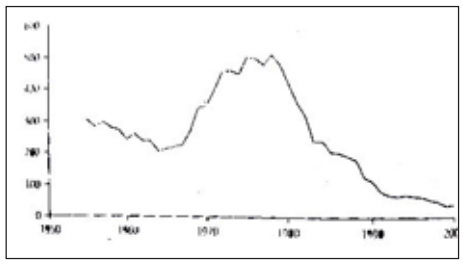

১৯৬০-এর দশকের শেষ দিক থেকে (যখন ''স্বর্ণ যুগ'', যা যুদ্ধ-পরবর্তীকালে সমঝোতার পর্যায় বলেও পরিচিত, শেষ হয়ে আসছিল) ১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত ধর্মঘটের একটা ঊর্ধ্বগতি আমরা দেখতে পাচ্ছি, তারপর ১৯৮০-র দশক থেকে তা দ্রুত নিচে নেমে আসে। দীর্ঘ পর্যায় ধরে ধর্মঘটের এই নিম্নগামিতার প্রতীক হয়ে উঠেছিল নয়া উদারবাদের বিশ্ব অভিযানের সূচনাকারী দুটি দেশে সংগঠিত দুটি ধর্মঘট।

এগুলো হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রণকারীদের ধর্মঘট এবং গ্রেট ব্রিটেনে খনি শ্রমিকদের ধর্মঘট—যেগুলো ১৯৭০-এর দশকের পরবর্তী পর্যায়ে আমেরিকা ও ব্রিটেনে শ্রমিক আন্দোলনের নির্ধারক মুহূর্ত বলে গণ্য হয়ে থাকে। উভয় ধর্মঘটই শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয় যা রেগান ও থ্যাচার সরকারকে তাদের রক্ষণশীল অর্থনৈতিক কর্মসূচী চালিয়ে নিয়ে যেতে সাহস যোগায়, যে কর্মসূচীর মধ্যে ছিল বিগত দশকগুলোতে শ্রমিক শ্রেণীর অর্জন করা অধিকার ও বেতন বৃদ্ধির ওপর ব্যাপক ও সফল আক্রমণ। শ্রেণী শত্রুর ওপর মর্মঘাতী পরাজয় চাপিয়ে দেওয়ার পর পুঁজি গোটা বিশ্বে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির নয়া মডেল হিসেবে নয়া উদারবাদের প্রাথমিক সংস্করণ রেগান অর্থনীতি ও থ্যাচারবাদকে সামনে নিয়ে এল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পেশাদার বিমান নিয়ন্ত্রণকারীদের সংগঠন (প্যাটকো) ছিল যথেষ্ট শক্তিশালী। তাদের শক্তি সংখ্যায় ছিল না, ছিল বিমান পরিবহন ও সংযোগের গোটা জালটার পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানের মধ্যে। ১৯৮০-র রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ট্রাক ড্রাইভার ও বিমান চালকদের এ্যাসোসিয়েশনের সাথে একযোগে এই ইউনিয়ন ডেমোক্র্যাটিক প্রার্থী জিমি কার্টারের বিরুদ্ধে রিপাবলিকান দলের প্রার্থী রোনাল্ড রেগানকে সমর্থনের সিদ্ধান্ত নেয়। রেগান নির্বাচনী প্রচারে ঐ ইউনিয়ন এবং কাজের পরিবেশের উন্নতির জন্য তাদের সংগ্রামকে সমর্থন জানান।

ঐ ইউনিয়ন কাজের আরও ভালো পরিবেশ, আরও ভালো বেতন ও ৩২ ঘন্টার কাজের সপ্তাহের দাবিতে ১৯৮১-র ৩ আগস্ট ধর্মঘট শুরু করে। সরকারি কর্মচারীদের ইউনিয়নগুলোর ধর্মঘটকে নিষিদ্ধ করা যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনকে এড়ানোর কৌশল হিসেবে তাঁরা অসুস্থতা দেখিয়ে কাজে যোগদান থেকে বিরত থাকলেন। রাষ্ট্রপতি রেগান সঙ্গে সঙ্গে প্যাটকোর ধর্মঘটকে ''জাতীয় নিরাপত্তার পক্ষে বিপদ'' বলে ঘোষণা করলেন এবং ১৯৪৭-এর টাফট-হার্টলে আইনের বলে তাদের কাজে যোগ দিতে বললেন। এরই সাথে তাদের জায়গায় অন্য লোকের ব্যবস্থা করা (তত্ত্বাবধায়ক, কর্মচারী ও কিছু নিয়ন্ত্রককে সেনাবাহিনী সহ অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে বদলি করা হল) এবং সম্ভাব্য সমস্ত পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকার পরিকল্পনা নেওয়া হল।

প্রায় ১৩০০০ নিয়ন্ত্রণকারীদের মধ্যে মাত্র ১৩০০ কর্মী কাজে যোগ দিলেন। আগস্ট মাসের ৫ তারিখে রেগান বাকি নিয়ন্ত্রণকারীদের বরখাস্ত করলেন এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় চাকুরি থেকে সারা জীবনের মত তাদের নিষিদ্ধ করলেন। বেশ কিছু ধর্মঘটীদের জেলে পাঠানো হল। ইউনিয়নের ওপর জরিমানা চাপানো হল এবং অবশেষে তাকে দেউলিয়া করে তোলা হল। ১৯৮১ সালের অক্টোবরে তাদের শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার কেড়ে নেওয়া হল।

এই ধর্মঘট ও পাইকারি হারে বরখাস্তের পর কর্তৃপক্ষকে যে দায়িত্বের মুখোমুখি হতে হল তা হল, বরখাস্ত হওয়া নিয়ন্ত্রণকারীদের স্থানে যথেষ্ট সংখ্যক নিয়ন্ত্রণকারীদের নিয়োগ করা ও তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া। ঐ কাজ সম্পন্ন করাটা যথেষ্ট সমস্যাসঙ্কুল হয়ে দেখা দিল, কেননা স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে একজন নতুন নিয়ন্ত্রণকারীকে প্রশিক্ষিত করে তুলতে তিন বছর সময় লাগে। সরকার প্রথমদিকে সমস্ত বিমানের কেবল ৫০ শতাংশই চালাতে পারল। কর্মচারীদের সংখ্যাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে প্রায় দশ বছর লেগে গেল।

ব্যবসায়িদের এবং সাধারণ জনগণকে যথেষ্ট অসুবিধার মধ্যে পড়তে হওয়া সত্ত্বেও যে কঠোরতার সঙ্গে রেগান ধর্মঘটের মোকাবিলা করেন তা সেই সময় ও তার পরবর্তীকালে যেমন প্রভূত প্রশংসিত হয় তেমনি আবার তীব্র সমালোচনার মুখেও পড়ে। আমেরিকার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান এলান গ্রীণস্প্যান ২০০৩ সালে বলেন, ''রাষ্ট্রপতি সেই আইনটার আশ্রয় নেন যাতে বলা হয়েছে যে ধর্মঘট করলে সরকারি কর্মচারীরা কাজ খোয়াবে। যারা ভেবেছিল যে কোন রাষ্ট্রপতির পক্ষেই ঐ আইনকে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়, ঐ পদক্ষেপ তাদের ধারণাকে ভেঙ্গে দিয়েছিল। আপনারা জানেন রাষ্ট্রপতি তা করেছিলেন, কিন্তু এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল তাঁর ঐ পদক্ষেপ বেসরকারি নিয়াগকর্তাদের সেই আইনি অধিকারকে পোক্ত করেছিল যার বলে তারা শ্রমিকদের নিয়োগ করা ও ছাঁটাই করার ব্যাপারে নিজেদের ইচ্ছাকে স্বাধীনভাবে প্রয়োগ করতে পারে, যে অধিকার এর আগে কখনই পুরোপুরি প্রয়োগ করা হয়নি।'' ঐ ঐতিহাসিক দমনের ৩০তম বার্ষিকীতে মাইকেল মুর বলেন, রেগনের প্যাটকো-র ধর্মঘটী কর্মীদের বরখাস্ত করার মধ্যে দিয়েই ''আমেরিকার অবনতির ধারা''র শুরু। এ এফ এল-সি আই ও তার সদস্যদের প্যাটকোর বেঁধে দেওয়া পিকেট লাইনকে অতিক্রম করার নির্দেশ দেওয়ার জন্যও তিনি তাদের দোষী সাব্যস্ত করেন (*আজ থেকে ৩০ বছর আগে ঃ যেদিন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মৃত্যু হল*, মাইকেল মুর, ডেইলি কস, ফ্রাই ৫ আগস্ট, ২০১১)। ঐ একই বছরে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসও যোসেফ ম্যাককার্টেন-এর লেখা বই প্রকাশ করে, যার শিরোনাম হল - *সংঘাতের পথ ঃ রোলাণ্ড রেগান, বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রণকারীরা, ও যে ধর্মঘট আমেরিকাকে পাল্টে দিয়েছিল*।

খনি শ্রমিকদের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় ''লৌহ মানবী'' গ্রেট ব্রিটেনের মার্গারেট থ্যাচারও কম কঠোরতা দেখাননি। জাতীয় কয়লা বোর্ড ১৯৮৪ সালের ৬ মার্চ ঘোষণা করল যে, ১৯৭৪-এর ধর্মঘটের পর (হিথ সরকারের পতনে যে ধর্মঘটের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল) সম্পাদিত চুক্তি অচল হয়ে গেছে। শিল্পে সরকার প্রদত্ত ভর্তুকিকে কমিয়ে আনতে তাঁরা ২০টি কয়লা খনিকে বন্ধ করে দেওয়ার কথা বললেন। এর অর্থ হল কুড়ি হাজার কাজ চলে যাওয়া। বন্ধ হয়ে যেতে পারে এমন কয়েকটি খনিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধর্মঘট শুরু হল। খনি শ্রমিকদের জাতীয় ইউনিয়ন (এন ইউ এম)—যা হল দেশের সবচেয়ে শক্তিশালী ইউনিয়নগুলোর অন্যতম—১৯৮৪ সালের ১২ মার্চ জাতীয় ধর্মঘট ঘোষণা করল যা অবিলম্বেই শুরু হয়ে গেল।

এই ধর্মঘটের আগের প্রেক্ষাপটের কিছু অংশকে তুলে ধরাটা এখানে জরুরী। ১৯৮১ সালে সরকার যখন ২৩টা খনি বন্ধ করে দেওয়ার পরিকল্পনা করছিল তখন ধর্মঘট প্রায় সংগঠিত হতে যাচ্ছিল। তবে ধর্মঘটের হুমকি দেওয়াটাই সরকারকে পিছিয়ে আসতে বাধ্য করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। বস্তুত, সরকার তখন ধর্মঘটকে এড়ানোরই চেষ্টা করল কেননা কয়লার মজুত কম ছিল, আর ধর্মঘট পরিস্থিতিকে আরও প্রতিকূল করে তুলত। পরের বছর সরকার ৫.২ শতাংশ বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব দিল যা আংশিকভাবে যুক্ত ছিল উৎপাদনের বৃদ্ধির সঙ্গে। ধর্মঘটের পক্ষে সায় দেওয়ার নেতৃত্বের আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করে ইউনিয়নের সদস্যরা ঐ প্রস্তাবকে গ্রহণ করলেন। এই চতুর পদক্ষেপটা ভবিষ্যতের অনিবার্য চূড়ান্ত মোকাবিলার ক্ষেত্রে সরকারকে যথেষ্ট কয়লা মজুত করতে সক্ষম করে তুলল।

সরকার এইভাবে এমন অবস্থানে এল যেখান থেকে সে ধর্মঘটের সরাসরি মোকাবিলা করতে পারবে। ২৯ মে অরগ্রিভে অবস্থান ধর্মঘটের সময় পুলিশের সঙ্গে পাঁচ হাজার ধর্মঘটী শ্রমিকের তীব্র সংঘর্ষ হল। তার পরদিন থ্যাচার তাঁর ভাষণে বললেন, ''... আমরা যা দেখছি তা হল আইনের শাসনকে হঠিয়ে তার জায়গায় উচ্ছৃঙ্খল জনতার শাসনকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা এবং *এটাকে সফল হতে দেওয়া যায় না* ... উচ্ছৃঙ্খল জনতার শাসনের বদলে আইনের শাসনকে অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।''

এই ধর্মঘটের প্রভাব আগেকার ধর্মঘটগুলোর ব্যাপকতার ধারে কাছে গেল না, যথা, ১৯৭০-এর দশকের গোড়ার দিকের ধর্মঘটগুলোর ক্ষেত্রে যেমন হয়েছিল। অধিকাংশ গৃহেই তেল বা গ্যাস দিয়ে উত্তপ্ত রাখার ব্যবস্থা ছিল এবং রেল পরিবহনকেও অনেক আগেই ডিজেল ও বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় পরিবর্তিত করা হয়েছিল। কয়লা খনিতে ধর্মঘটের ফলে বিদ্যুৎ ঘাটতির সমস্যার সম্ভাবনাকে থ্যাচার সরকার স্বীকার করেছিল। কিন্তু সরকার বলল যে, ব্রিটেনের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোকে নিজেদেরই কয়লা মজুতের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে করে শিল্পক্ষেত্রে যে কোন আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে সেগুলোকে চালু রাখা যায়। কয়লা শ্রমিকদের ধর্মঘটের সময় এই কৌশল প্রচণ্ডরূপে সফল হয়ে দেখা দিল, কেননা বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো ১৯৮৪-র শীতকালেও বিদ্যুৎ সরবরাহ অব্যাহত রাখতে পারল।

ধর্মঘট শুরু হওয়ার প্রায় এক বছর পর ১৯৮৫-র ৩ মার্চ তা শেষ হল। ইউনিয়নকে বাঁচানোর লক্ষ্যে এন ইউ এম ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে নতুন কোন চুক্তি ছাড়াই অল্প ভোটের ব্যবধানে কাজে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল।

১৯৮০-র দশকে এইভাবে নয়া উদারবাদী আক্রমণ শ্রেণী প্রতিপক্ষকে রক্ষণাত্মক অবস্থানে ঠেলে দিয়ে তার আক্রমণের সূচনা ঘটাল। ভুবনিকরণ হয়ে উঠল একটা যাদু শব্দ এবং সোভিয়েত পরবর্তী প্রেক্ষাপটে বিজয় চিহ্ন 'টিনা'কে (অন্য কোন বিকল্প নেই) যখন তুলে ধরা হল, অনেকেই—যদিও সবাই নয়—ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় সেটাকে গ্রহণ করলেন।

লাতিন আমেরিকায় জনগণের বিদ্রোহ

তবে সেটা কিন্তু স্থায়ী পরাজয় ছিল না; এবং তা হতেও পারে না। তৃতীয় বিশ্বে পশ্চিমী নয়া উদারবাদের প্রথম শিকার লাতিন আমেরিকায় বর্তমান সহস্রাব্দের শুরুতে ঐ দানবের বিরুদ্ধে গড়ে উঠল একের পর এক দীর্ঘস্থায়ী ও সফল বিদ্রোহ ঃ ইকুয়েডরে আদিবাসী ইণ্ডিয়ানদের বিদ্রোহ নয়া উদারবাদী প্রেসিডেন্টকে ক্ষমতাচ্যুত করল; আর্জেন্টিনায় বিদ্রোহের একের পর এক ঢেউ বেশ কিছু প্রেসিডেন্টকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিল এবং ২০০১-০২ সাল বিপ্লবী সংকটের জন্ম দিল; ভেনিজুয়েলায় ২০০২-এর এপ্রিলে জনগণের বিদ্রোহ সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে অপসারিত প্রেসিডেন্ট হুগো শাভেসকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনল; বলিভিয়ায় ২০০৩-এর গ্যাস যুদ্ধ নয়া উদারবাদবাদী প্রেসিডেন্টকে ক্ষমতাচ্যুত করল; ঘটে গেল এইরকম আরও অনেক ঘটনা।

আমাদের দেশে যে বিক্ষিপ্ত বিস্ফোরণগুলো আমরা দেখতে পাই তার তুলনায় সেখানকার জনগণের এই আন্দোলনগুলো ছিল অনেক বেশি দীর্ঘস্থায়ী, যদিও কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে নয়। সেগুলো এমন সমস্ত শক্তিকে ক্ষমতায় নিয়ে আসে যারা মার্কিন আধিপত্যের এবং বিভিন্ন মাত্রায় নয়া উদারবাদের বিরোধিতা করল। এই সমস্ত সরকার গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কার প্রতিষ্ঠিত করল এবং জাতীয় সম্পদের ওপর আংশিকভাবে সরকারি নিয়ন্ত্রণকে ফিরিয়ে আনল (ভেনিজুয়েলায় ১৯৯৯ থেকে, বলিভিয়ায় ২০০৬ থেকে, ইকুয়েডরে ২০০৭ থেকে)। জনগণের চাপে এমনকি আর্জেন্টিনার কিরচনারকেও কিছু প্রগতিশীল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছিল। এদের মধ্যে কিছু দেশে—যার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ভেনিজুয়েলা, বলিভিয়া ও ইকুয়েডর—এক ধরনের প্রাথমিক স্তরের সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের পরীক্ষানিরীক্ষা নানারকম ধাক্কার মধ্যে দিয়েও ধারাবাহিকভাবে অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

বিশ্ব সামাজিক ফোরামও (২০০১-এর জানুয়ারি) লাতিন আমেরিকার মাটি থেকে উদ্ভুত হয়ে তার টিনা-বিরোধী ''আর একটা বিশ্ব সম্ভব'' শ্লোগান নিয়ে বাকি দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। এর সঙ্গেই ১৯৯৯ থেকে ২০০১-এর মধ্যে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা, বিশ্ব ব্যাঙ্ক, আই এম এফ এবং জি-৮ গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিশাল বিশাল গণবিক্ষোভ সংগঠিত হয় যথাক্রমে সিয়াটেল, ওয়াশিংটন, প্রাগ ও জেনোয়ায়।

এই আন্দোলনগুলো ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে পড়েছিল কারণ—পরবর্তী পর্যায়ে কি করা হবে সে সম্পর্কে তাদের কোন ধারণা ছিল না এবং সেগুলো ক্রমেই পশ্চিম দুনিয়ার সন্দেহজনক এনজিও-গুলোর কব্জায় চলে গিয়েছিল। যথেষ্ট প্রতিশ্রুতিময় সূচনা সত্ত্বেও বিশ্ব সামাজিক ফোরাম ক্ষোভের কিছু বাষ্প নির্গমনের সেফটি ভালভে পরিণত হল। তবে আমাদের এটাও স্বীকার করতে হবে যে, ঐ আন্দোলনগুলো জনগণের চেতনা ও সক্রিয়তাকে বাড়াতে সাহায্য করেছিল। এই প্রেক্ষাপটেই বিকাশলাভ করল নয়া উদারবাদী সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার সঙ্গে মোকাবিলার পরবর্তী অর্থাৎ বর্তমান পর্যায়। (ক্রমশ) - **অরিন্দম সেন**

''আজকের দেশব্রতী'' সম্পাদকমণ্ডলী

অনিমেষ চক্রবর্তী, সুকান্ত মণ্ডল, অতনু চক্রবর্তী, জয়দীপ মিত্র, অমিত দাশগুপ্ত, সৌভিক ঘোষাল ও কল্যাণ গোস্বামী

দিল্লীতে গণধর্ষণের প্রতিক্রিয়ায় ...

একের পাতার পর

সমাজের জড়তা ধরেও টান দিয়েছে।

সরকারি তথ্যে প্রকাশ, শুধুমাত্র ২০১১ সালে ২৩,৯৩৭টি ধর্ষণের অপরাধ নথিভুক্ত হয়েছে। গত চল্লিশ বছরে ধর্ষণের অপরাধ বেড়েছে ৭৯১ শতাংশ। আর অপরাধের সাজা? ১৯৭১ সালে যা ছিল ৪১ শতাংশ তা কমে ৪০ বছর পরে হয়েছে ২৭ শতাংশ! অর্থাৎ পুলিশের খাতায় ১০০টা ধর্ষণের অভিযোগ উঠলে সাজা পাচ্ছে মাত্র ২৭টা ঘটনার অপরাধীরা। মনে রাখতে হবে এই সংখ্যা শুধু পুলিশের খাতায় ওঠা অভিযোগের ভিত্তিতে। আসলে দোষীদের সংখ্যা আরও বেশী, কারণ প্রত্যেকটি ধর্ষণের অভিযোগ এখনও খাতায় লেখা হয় না, খাতায় যা ওঠে তার কম করে ৫০ শতাংশ অভিযোগ নথিভুক্ত হয় না। বরং বলা উচিত, অভিযোগ নেওয়া হয় না, অভিযোগ করতে দেওয়া হয় না। অভিযোগ যদিও নথীভুক্ত করাও হয়—তাহলেও থানায় এফ আই আর দায়ের করাতে, ফরেনসিক সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহে, হাসপাতালে মেডিক্যাল পরীক্ষার সময়, বছরের পর বছর ধরে চলা ট্রায়াল এবং অবশেষে কোর্টে বিচারের সময়ে—প্রত্যেকটা পদে পদে নাকাল করা হয়, চরম হেনস্থা করা হয় অভিযোগকারিণীকেই (পার্ক স্ট্রীট, জগাছা, রূপনারায়ণপুর—পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রতিককালে সবকটি ঘটনায় এই একই জঘন্য পুরুষতান্ত্রিক আবর্তের বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছেন অভিযোগকারিণীরা।)। এত কিছুর পরেও সরকার পক্ষের উকিল এবং পুলিশের গাফিলতিতে, বা কখনো বিচার বেঞ্চের লিঙ্গবৈষম্যের কারণে দোষীরা ছাড়া পেয়ে যায়।

দিল্লীর ঘটনার পরবর্তীতে মুখ্যমন্ত্রী শীলা দীক্ষিতের বাসভবনের সামনে, দিল্লী পুলিশের হেড কোয়ার্টারের সামনে, যন্তর-মন্তর, ইণ্ডিয়া গেট, বিজয় চক, রাষ্ট্রপতি ভবনের সামনের রাজপথ জুড়ে এত বিপুল সংখ্যায় মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিবাদে নেমেছেন যা লিঙ্গ হিংসার বিরোধিতার প্রশ্নে অভূতপূর্ব। টিয়ার গ্যাস, জলকামান—কোনও কিছু দিয়েই যখন জনস্রোতকে রোখা যায়নি, তখন পুলিশ একের পর এক মেট্রো স্টেশন বন্ধ করে, ১৪৪ ধারা জারি করে লাঠি চালিয়েছে প্রতিবাদী জনতার ওপর। আইসা-আইপোয়া-আর ওয়াই এ সহ আরও অনেক গণসংগঠন ছিল আন্দোলনের সামনের সারিতে। জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়ন ঘটনার পরের দিনই বসন্তবিহার থানা ঘেরাও করে। আইসা-আর ওয়াই এ-আইপোয়া-র পক্ষ থেকে শীলা দীক্ষিতের বাড়িতে প্রতিবাদ বিক্ষোভ জানাতে গেলে প্রথমেই লাঠি চালনার শুরু। কিন্তু বাম-গণতান্ত্রিক আন্দোলনকারীদের সীমানা ছাড়িয়ে এই আন্দোলন নাড়া দিয়েছে মধ্যবিত্ত ছাত্রসমাজের বিবেককে। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিকভাবে নিথর কলেজগুলো থেকে দলে দলে ছাত্রী-ছাত্র পথে নেমে জানিয়ে দিয়েছেন ধর্ষণের বিরুদ্ধে তাদের ক্ষোভ।

দিল্লীর লিঙ্গ হিংসার ঘটনা, লাগাতার যৌন হিংসার মহামারী এবং প্রতিবাদের নানারকম ভাষার মধ্যে দিয়ে যে স্বর উঠে আসছে তা আমাদের পিতৃতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোকেই চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে। ধর্ষণকে আমরা কী ধরনের হিংসা হিসেবে দেখব, তার কী ধরনের শাস্তি চাইব, ধর্ষণের অপরাধী কারা—তারা কী সমাজের কিছু বিক্ষিপ্ত বিকৃত মানুষ না তারা আমাদের মধ্যেই রয়েছে, যৌন হিংসার শিকড় কোথায় এবং কীভাবে তাকে উপড়ে ফেলতে হবে—এই মূল প্রশ্নগুলো নিয়ে বৃহত্তর জনসমাজকে আজ চিন্তাভাবনা করতে হবে গভীরভাবে এবং উত্তরগুলোও খুঁজে নিতে হবে।

ধর্ষণের ঘটনার ক্ষেত্রে নারীর অধিকারের ওপর আক্রমণের থেকে নজর সরিয়ে সম্পূর্ণ উল্টো করে দেখাবার একটা প্রবণতা সমাজের মধ্যেই রয়েছে। তাই 'মা-বোনে'র সম্মানরক্ষার একটি বিষয় হিসেবে ধর্ষণের বিরোধিতাকে উত্তেজক বক্তব্যতে দেখানো হয়। সম্মান-রক্ষাটি অনেক ক্ষেত্রেই আর মেয়েটির নিজস্ব ব্যক্তিগত অধিকারের বিষয় হিসেবে থাকে না, সামাজিক বা পারিবারিক সম্মান রক্ষার বিষয় হয়ে যায়। এবং 'সমাজ মেয়েদের পক্ষে নিরাপদ না' এই অজুহাতে তাদের জীবনযাপনে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা চলে। ফলে একটা বিশেষ সময়ের আগে বাড়ি ফেরা, বিশেষ ধরনের পোষাক না পরা, বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গ এড়িয়ে চলা ইত্যাদি আপাত 'বাস্তবসম্মত' সমাধান দেওয়ার চেষ্টা চলে। কিন্তু এই সমস্ত যুক্তির সমস্যা এই যে ধর্ষণ হয় মেয়েদের একটা শিক্ষা দেওয়ার জন্য। যাতে তারা মানুষের মত মাথা তুলে না দাঁড়ায়। এবং যে পুরুষতন্ত্র ধর্ষণের জনক শেষ বিচারে সেই-ই আরও পুষ্ট হয়। এটা নিছক আশঙ্কা নয়। ইতিমধ্যেই দিল্লীর ঘটনার পর ২,৫০০ নারী-পুরুষের মধ্যে চালানো একটি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে ৮৮ শতাংশ নারী কর্মচারী যারা কর্মসূত্রে বাড়ির থেকে দূরে রয়েছেন তাদের অভিভাবক এবং স্বামীরা উদ্বিগ্ন হয়ে ফোন করছেন। দিল্লী সন্নিহিত অঞ্চলে ৭৪ শতাংশ কর্মরত নারী সন্ধ্যের আগেই বাড়ি ফিরে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। এই 'বাস্তবসম্মত' সমাধানগুলো মধ্যবিত্ত সমাজের, এমনকি তাদের মধ্যে এগিয়ে থাকা অংশের মধ্যেও বৈধতা পেয়ে যায়। এর বিপরীতে দাঁড়িয়ে দাবি হল, পথেঘাটে নির্ভয়ে চলার বন্দোবস্ত সরকারকেই করতে হবে। রাস্তায় যথেষ্ট পরিমাণে আলো, মহিলা ও পুরুষ পুলিশকর্মী মোতায়েন, সরকারি যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। কলকাতার ক্ষেত্রে যেমন প্রশ্ন উঠবে মেট্রো রেল কেন রাত বাড়লেই বন্ধ হয়ে যাবে? কেন সরকারি বাস-ট্রাম রাত বাড়লেই অপ্রতুল?

কোন কোন মহল থেকে, বিশেষত বিজেপির পক্ষ থেকে ধর্ষণের বিরুদ্ধে চলা এই আন্দোলনকে কেবলমাত্র ধর্ষকের ফাঁসির দাবির আন্দোলনে পর্যবসিত করার চেষ্টা চলছে। কোনও কোনও মহলে শাস্তি হিসেবে চাওয়া হচ্ছে রাসায়নিক লিঙ্গচ্ছেদ। রাসায়নিক বা অন্য যে কোনও লিঙ্গচ্ছেদ কখনোই ধর্ষণের শাস্তি হতে পার না। কারণ, ধর্ষণ শুধুমাত্র জৈবিক কামনাজনিত অপরাধ নয়, ধর্ষণ জোর খাটিয়ে দমন করার প্রবৃত্তির প্রকাশ। শিশুকন্যা, বৃদ্ধা, বালিকা, স্ত্রী—যে কোনও কারুর ওপর পুরুষত্ব, প্রভুত্ব, আধিপত্য বিস্তার করতে ধর্ষণকে ব্যবহার করা হয়। বিজেপির ধর্ষককে ফাঁসি দেওয়ার দাবি আসলে তাদের লিঙ্গসর্বস্ব পিতৃতান্ত্রিক মনোভাবকেই প্রকট করে তোলে। যখন কর্ণাটকে পানাশালায় যাওয়ার 'অপরাধে' বা জিনস্ পরার কারণে বিজেপির শাখামৃগরা মহিলাদের ওপর লাঠি নিয়ে চড়াও হয়, যখন রূপম পাঠককে ধর্ষণ করে বিজেপির বিধায়ক পার্টির সমর্থন পেয়ে যায়, যখন গণধর্ষণের প্রধান অভিযুক্ত মনসুখ ভুবা বিজেপির টিকিটে বিধায়ক হয়, যখন নরেন্দ্র মোদীর পরিচালনায় দাঙ্গার সময়ে গুজরাতের মহিলারা ধর্ষিতা হন—তখন তাদের কাছ থেকে আর কীই বা আশা করা যায়। বিজেপি নেত্রী সুষমা স্বরাজ দিল্লীর ধর্ষিতা মেয়েটিকে 'জীবন্ত লাশ' আখ্যা দিয়ে সংসদে দাঁড়িয়ে বলেছেন—''এই ঘটনার ফলে মেয়েটির বেঁচে থাকা মৃত্যুর চেয়েও ভয়ানক''। এই নেত্রী যিনি নাকি 'করওয়া চৌথ' নামক সতীত্বের উৎসবে পার্টি দিয়ে বেড়ান, নারীদের প্রতি চরম অবমাননাকর এই উক্তির জন্য তাঁকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে বলা হোক। সুষমা স্বরাজের মত নেতা-নেত্রীদের ধিক্কার!

ফাঁসির প্রসঙ্গে মহিলা সংগঠনগুলোর বড় অংশ মনে করে যে ফাঁসি কোনও সমাধান নয়। 'ফাঁসি নেই' এই কারণে ধর্ষণ বাড়ছে না—ধর্ষণ বাড়ছে কারণ অপরাধীরা ধরা পড়ছে না, ধরা পড়লেও কঠোর শাস্তি পাচ্ছে না। সেই ব্যবস্থা করাই জরুরী। তাছাড়া, ধর্ষকের ফাঁসি চাইলেই সব মিটে যাবে এটা ভেবে কোথাও একটা সমস্যার ব্যাপ্তিকেই অস্বীকার করা হয়ে যায়। গত বছরে আমাদের দেশে যে ২৩,৯৩৭টি ধর্ষণের ঘটনা খাতায় উঠেছে, তার ৯৪ শতাংশ ক্ষেত্রেই ধর্ষক মেয়েটির পরিচিত ছিল। প্রায় ৯০০০টি ক্ষেত্রে পরিবারের মানুষ এবং প্রতিবেশী----বাবা, কাকা, মামা, দাদারা ধর্ষণ করেছেন। বৈবাহিক ধর্ষণের ঘটনা ঘটে ঘরে ঘরে—ভারতীয় দণ্ডবিধি সে বিষয়ে যতই নীরব থাকুক। তাই ধর্ষকদের দু-চার জনকে ফাঁসি দিলেই নিশ্চিন্ত হওয়ার নয়।

রাষ্ট্র এবং সমাজের প্রত্যক্ষ মদতে ধর্ষণের প্রসঙ্গ না তুললে লিঙ্গ হিংসার বিরুদ্ধে বক্তব্য অসমাপ্ত থেকে যাবে। জাতি-হিংসা, ধর্মীয়-হিংসা এবং সেনাবাহিনী ও পুলিশী ধর্ষণ ভারতীয় গণতন্ত্রের মুখ পুড়িয়েছে। খৈরলানজির গণধর্ষণ এবং আজ পর্যন্ত জাতি হিংসায় অসংখ্য দলিত মহিলা ও শিশুকন্যার ধর্ষণ কোন সমাজের পরিচয় বহন করে? ধর্মীয় দাঙ্গায় যৌন হিংসাকে চরম হিংস্রতার সঙ্গে ব্যবহার করেছে গুজরাত সরকার—যার ন্যায়বিচার সুদূর অস্ত। ভারত রাষ্ট্র যে কীভাবে পুরুষতান্ত্রিক অত্যাচারকে জাতি-দমনের হাতিয়ার করে তুলেছে তার চিহ্ন কাশ্মীর-মণিপুর-ছত্তিশগড়ের সর্বত্র বর্তমান। মণিপুরের মনোরমার সেনাবাহিনীকৃত ধর্ষণের পর কারুর শাস্তি হয়নি। কুড়ি বছর আগে কাশ্মীরের কুনান-পুশপোরায় একই রাতে ৫৩ জন মহিলাকে সেনাবাহিনী ধর্ষণ করে। সেই ঘটনায় কারুর সাজা হওয়ার কথা আমরা কি শুনেছি? ছত্তিশগড়ের স্কুল শিক্ষিকা সোনি সোড়ির যৌনাঙ্গে পাথর ঢুকিয়ে তাকে থানার মধ্যে গণধর্ষণ করে পুলিশ অফিসার অঙ্কিত গর্গ প্রজাতন্ত্র দিবসে বীরত্বের মেডেল পেয়েছেন। কাশ্মীরে নীলোফার জান ও আসিয়া জানকে ধর্ষণের পর খুন করে সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ লোপের মরিয়া চেষ্টা করেছে রাহুল গান্ধীর প্রিয় বন্ধু ওমর আবদুল্লার পুলিশ-প্রশাসন। জঙ্গলমহলে যৌথবাহিনীর হাতে শিবানী সিংহের ধর্ষণ কোন ন্যায়বিচার পেয়েছে তার জবাব দিয়েছে 'পরিবর্তন'-এর প্রতিশ্রুতি দেওয়া রাজ্য সরকার?

ধর্ষণ কেবলমাত্র কোনও ব্যক্তি মানুষের মনোবিকৃতির ফল নয়, বা ব্যক্তি নারীর একার সমস্যাও নয়। বিকৃতি আসলে আছে এই গোটা পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোয়। তাই লড়াই জারি রাখতে হবে পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে, আর যে রাষ্ট্র এই পুরুষতন্ত্রকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করে, তার বিরুদ্ধেও।

- কস্তুরী

ধর্ষণকারীদের শাস্তি সুনিশ্চিত করতে হবে। ১০০ শতাংশ ক্ষেত্রেই অপরাধীকে সাজা দিতে হবে। সমাজ, রাজনীতি, আইন-প্রশাসনের প্রত্যেক স্তরে বুনিয়াদী পরিবর্তন আনতে হবে।

অবিলম্বে সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডেকে (বৈবাহিক সম্পর্কে ধর্ষণ এবং সেনাবাহিনীকৃত ধর্ষণ সহ) সমস্ত রকম যৌন আক্রমণ এবং 'সম্মান রক্ষার' নামে যৌন হিংসার বিরুদ্ধে কঠোরতম এবং কার্যকরী আইন লাগু করতে হবে। বৈবাহিক ধর্ষণকে আইনি স্বীকৃতি দিতে হবে। ধর্ষণের প্রথাগত সংজ্ঞাকে বদলে (পুরুষাঙ্গ ব্যতীত অন্য বস্তুর প্রবেশ ইত্যাদিকে আইনের আওতায় এনে) আইনের সীমাবদ্ধতা বদলাতে হবে।

যৌন হিংসা বিরোধী আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক নারী আন্দোলনের সংগঠনগুলোর সাথে আলোচনা করতে হবে।

ধর্ষণ, যৌন নিগ্রহ সহ সমস্ত রকম যৌন হিংসার অভিযোগের বিচারের জন্য ফাস্ট-ট্রাক কোর্ট ব্যবস্থা চালু করতে হবে। সর্বাধিক তিন মাসের মধ্যে প্রত্যেকটি মামলার নিষ্পত্তি করতে হবে। যদি কোনও পুলিশকর্মী বা বিচারপতি ধর্ষণের সাফাই দেন, বা মেয়েদের পোষাক, চরিত্র, সম্মান, নীতি ইত্যাদি সম্পর্কে কোনও মন্তব্য বা নারীবিরোধী বক্তব্য রাখেন তাহলে তাকে তার পদ থেকে অবিলম্বে বরখাস্ত করতে হবে।

পুলিশ কর্মীদের লিঙ্গ সাম্যের ব্যাপারে সচেতন করে তুলতে হবে। ধর্ষণের অভিযোগ এলে এফ আই আর নেওয়া থেকে শুরু করে কীভাবে তদন্ত এগোতে হবে সেই বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। ধর্ষণের অভিযোগ গ্রহণে বিন্দুমাত্র গাফিলতির বিরুদ্ধে কঠোর সাজার ব্যবস্থা নিতে হবে।

হাসপাতালে ধর্ষিতা মহিলার শারীরিক চিকিৎসা এবং মনোবৈজ্ঞানিক সহায়তার যাবতীয় ব্যবস্থার জন্য আলাদা ওয়ার্ড করতে হবে এবং অবিলম্বে ফরেনসিক তদন্তের সরঞ্জাম সেখানে মজুত করতে হবে।

লিঙ্গ হিংসার ধারক ও বাহক সংস্কৃতির বিরুদ্ধে আগ্রাসী সংগ্রাম করতে হবে। যে জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মচারি, বিচারপতি বা পদস্থ আধিকারিকরা পারিবারিক হিংসা, সম্মান হিংসা সহ যে কোনও রকম যৌন হিংসার সাফাইদাতা তাদের পদচ্যুত করতে হবে।

যারা যৌন হিংসার শিকার, সরকারি খরচে তাদের সমস্ত রকম সামাজিক, আইনগত, চিকিৎসাগত এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতা করতে হবে।

লিঙ্গসাম্যের সচেতনা তৈরি করতে স্কুলের পাঠক্রমে এর অন্তর্ভুক্তি করতে হবে। নারী আন্দোলনের কর্মীদের সাথে আলোচনা করে নারীবিদ্বেষ, পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা, নারী স্বাধীনতা বিরোধী মনোভাব নির্মূল করতে উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

আংশিক সময়ের অধ্যাপকরা ফের আন্দোলনে

গত ২০ ডিসেম্বর ২০১২ কুটাবের নেতৃত্বে আংশিক সময়ের প্রায় পাঁচ শতাধিক অধ্যাপক বিকাশ ভবনে বিক্ষোভ সমাবেশ করেন। তাঁদের মূল দাবি ছিল মাস পয়লা বেতন পাওয়ার, পূর্ণসময়ের (সপ্তাহে পাঁচ দিন) কাজের দাবি, সামাজিক মর্যাদার দাবি, কলেজের টিচার্স কাউন্সিল ও পরিচালন সমিতির সদস্য হওয়ার দাবি। এমনিতে আংশিক সময়ের অধ্যাপকদের বিগত বামফ্রন্ট সরকার ৬০ বছর পর্যন্ত কাজের অধিকারের নিশ্চয়তা দিয়ে গিয়েছিল এবং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ন্যূনতম বেতন ও সপ্তাহে ১০টি ক্লাস নেওয়ার বিনিময়ে নির্দিষ্ট করেছিল। সরকারের পক্ষ থেকে প্রতি মাসে নির্দিষ্ট বেতনও দেওয়ার কথা ছিল, তা দেওয়া হচ্ছে কিন্তু তা এঁরা পাচ্ছেন নয় মাস ছয় মাস পর। বর্তমানে পরিবর্তনের সরকার শিক্ষা সংক্রান্ত যে নতুন বিল আনতে চলেছে তাতে আংশিক সময়ের অধ্যাপকদের শিক্ষক হিসাবে দেখানো হচ্ছে না। এঁরা কলেজের সমস্ত দায়িত্ব পালন করেন, ক্লাস নেন, পরীক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন কিন্তু মর্যাদা পান না। এঁরা কলেজের প্রয়োজনে সপ্তাহে ১৫ থেকে ২০টি ক্লাস নিয়ে থাকেন বা নিতে বাধ্য হন, কিন্তু এঁদের সপ্তাহে ১০টি ক্লাস নেওয়ার কথা। এছাড়া ১৯৮৯ পর্যন্ত কলেজে শিক্ষাদান করতেন যে সমস্ত আংশিক সময়ের শিক্ষক তাঁদেরও স্থায়ী করা হয়েছে। গ্রেডেড টিচাররাও এখন পূর্ণ স্কেলে বেতন পেয়ে থাকেন। অথচ যাঁরা ১৫-২০ বছর আংশিক সময়ের শিক্ষকতায় যুক্ত আছেন এবং ইউ জি সি মানে উত্তীর্ণ তাঁরা বঞ্চিত হবেন কেন? আসলে শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির মাধ্যমে লুটেপুটে খাওয়ার ব্যাপারটাই প্রাধান্য পাচ্ছে। এখানে আংশিক সময়ের অধ্যাপকরা সে কারণেই বঞ্চিতই হয়ে থাকবেন। পরিবর্তনের সরকারের কাছে কি এটিই কাম্য? ফলে আংশিক সময়ের অধ্যাপকরা ফের আন্দোলনের পথে। তবে আংশিক সময়ের বিভিন্ন সংগঠন ঐক্যবদ্ধভাবে যদি আন্দোলন করতে না পারেন তাহলে আন্দোলন দুর্বলই থাকবে এবং তাতে সরকারেরই সুবিধা।

জাতীয়

২ ফেব্রুয়ারী ঃ সুপ্রীম কোর্টে প্রাক্তন টেলিকম মন্ত্রী এ রাজার আমলে দেওয়া ১২২টি ২-জি লাইসেন্স বাতিল হয়।

৫ ফেব্রুয়ারী ঃ পার্ক স্ট্রিটে ধর্ষিতা হন জনৈকা তরুণী। পুলিশ এফ আই আর নিতে অরাজী হয়ে কটুক্তি করে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী ও অন্যান্য কয়েকজন মন্ত্রী ঘটনাটির সত্যতা অস্বীকার করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'সাজানো ঘটনা'। পরে গোয়েন্দা প্রধান দময়ন্তী সেন ঘটনাটি সামনে নিয়ে এলে তাকে বদলি করে শাস্তি দেওয়া হয়।

৬ মার্চ ঃ অনেকগুলো রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হয়। উত্তরপ্রদেশে সমাজবাদী পার্টি, গোয়ায় ভারতীয় জনতা দল, পাঞ্জাবে শিরোমণি অকালি দল-বিজেপি জোট, মণিপুর ও উত্তরাখণ্ডে কংগ্রেস ক্ষমতায় আসে।

২২ মার্চ ঃ সকালবেলা কাগজ খুলে দেশবাসী শুনলেন এখনও অবধি সবচেয়ে বড় অঙ্কের দুর্নীতির খবর। টাইমস অব ইণ্ডিয়া সহ বিশিষ্ট কিছু সংবাদ মাধ্যম জানাল ২০০৪ থেকে ২০০৯-এর মধ্যে কোনরকম নিলাম ছাড়াই সরকার বিভিন্ন বাণিজ্যিক সংস্থাকে মোট ১৫৫টি কয়লা খনি উত্তোলনের জন্য দিয়েছে, আর এই অন্যায্য সুবিধা দানের জন্য সরকারের ক্ষতির মোট পরিমাণ ১০.৬৭ লক্ষ কোটি টাকা। এই সংবাদের সূত্র স্বয়ং কয়লা খনির বরাত সংক্রান্ত ক্যাগ (কম্পট্রোলার এ্যাণ্ড অডিটর জেনারেল'স)-এর ড্রাফট রিপোর্টটিই।

১৬ এপ্রিল ঃ পাটনা হাইকোর্টের রায় বেকসুর খালাস করা হল ১৯৯৬-এ বাথানিটোলা গণহত্যার অভিযুক্তদের। ২০১০-এ আরা সেশন কোর্ট যে ২৩ জনকে দোষী সাব্যস্ত করেছিল, এই রায় তাদের সবাইকেই বেকসুর খালাস করে দেয়। বিহারে সামন্ত শক্তির কাছে নীতীশ সরকার নতজানু হলেও গোটা দেশ বিক্ষোভে উত্তাল হয় বাথানিটোলার ঘটনার ন্যায়বিচারের দাবিতে। বাথানিটোলার ঘটনায় অভিযুক্তদের মুক্তির ঘটনায় ক্ষুব্ধ প্রথিতযশা বিচারক, আইনজীবী, বিদ্বৎজন এবং গণ আন্দোলনের কর্মীরা গড়ে তোলেন ''বাথানিটোলার জন্য নাগরিকবৃন্দ'' নামের এক নাগরিক সমন্বয়। তারা ১৫ জুলাই দিল্লীর কনস্টিটিউশান ক্লাব স্পিকার হলে ''বাথানিটোলার (১৯৯৬) জন্য ন্যায়বিচার—দোষীদের শাস্তি চাই'' শীর্ষক এক কনভেনশনের আয়োজন করেন।

৮ মে ঃ এয়ার ইণ্ডিয়া পাইলটরা ধর্মঘট শুরু করেন। ১০০-র বেশী পাইলট ধর্মঘটে যোগ দেন।

২২ জুন ঃ কলকাতা হাইকোর্ট সিঙ্গুর জমি অধিগ্রহণ আইনকে অবৈধ বলে ঘোষণা করে।

১৮ জুলাই ঃ মারুতি সুজুকির মানেসর কারখানায় শ্রমিক বিক্ষোভের উদ্গীরণ ঘটে। একজন আধিকারিক মারা যান। হরিয়ানা সরকার শ্রমিকদের একাংশকে ঘটনার জন্য দায়ী করে মাসের পর মাস জেলবন্দী করে রাখে। কারখানা খোলার পর কর্তৃপক্ষ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগ দেখিয়ে বহু সংখ্যক শ্রমিককে ছাঁটাই করে। শ্রমিকদের যুক্তি ও পুনর্বহালের দাবিতে আন্দোলন চলতে থাকে। পাশাপাশি ঠিকা শ্রমিক প্রথার ব্যাপকতা; কম মজুরিতে দীর্ঘ কাজের সময়, নিরাপত্তা ও উপযুক্ত কাজের পরিবেশের অভাবই যে এ ধরনের অসন্তোষের জন্ম দিয়ে বিস্ফোরণের পরিস্থিতি তৈরি করে, সে বিষয়টিও সামনে আসে।

১৯ জুলাই ঃ আসামের কোকরাঝাড় এলাকা ও সংলগ্ন অঞ্চলে উদ্বেগজনক জাতিদাঙ্গার ঘটনা শুরু হয়। এই দাঙ্গায় প্রায় ৬০ জন মারা যান, গৃহহারা হন ৪ লক্ষেরও বেশি।

৮ আগস্ট ঃ আসাম দাঙ্গার অভিঘাত ছড়ায় সমস্ত দেশে। গোটা উত্তর পূর্বের হাজার হাজার মানুষ আতঙ্কিত হয়ে দক্ষিণ ভারত ও অন্যত্র থেকে ঘরে ফিরে আসেন।

৯ আগস্ট ঃ সারা দেশের হাজার হাজার ছাত্র যুব সংসদ অভিযানে যোগ দেয়। আইসা এবং বিপ্লবী যুব এ্যাসোসিয়েশনের নেতৃত্বে দেশজুড়ে দুর্নীতি ও কর্পোরেট লুটের বিরুদ্ধে তিন মাসব্যাপী প্রচারের পর এই কর্মসূচী নেওয়া হয়। দুর্নীতি ও লুটের রাজত্বের বিরোধিতার পাশাপাশি সকলের জন্য যথাযথ শিক্ষা ও মর্যাদাপূর্ণ কাজের দাবিতে আওয়াজ তোলা হয়। সংসদ অভিযানের আগে যন্তর মন্তর চত্বরে বিশাল সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা থেকে শ্লোগান ওঠে—'কর্পোরেট লুঠেরারা ভারত ছাড়', 'ইউ পি এ সরকার কর্পোরেটদের ভর্তুকি দিচ্ছে আর শিক্ষাকে বেচে দিচ্ছে'।

১৫ অক্টোবর ঃ সি পি আই (এম এল) এবং সি পি আই, সি পি এমের ডাকে বিহারে পুলিশী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সফল ধর্মঘট।

৯ নভেম্বর ঃ বিহারে সি পি আই (এম এল)-এর ''পরিবর্তন র‍্যালি''তে অতীতের সমস্ত রেকর্ড ভাঙ্গা জনজোয়ার, রাজ্য জুড়ে আলোড়ন।

১৭ নভেম্বর ঃ শিবসেনা প্রধান বাল থ্যাকারের মৃত্যু হয়। অচল মুম্বাই নিয়ে ফেসবুকে মন্তব্য করার জন্য দুই তরুণীকে গ্রেপ্তার করা হয়, যারা ধর্মগতভাবে মুসলিম।

১৬ ডিসেম্বর ঃ দিল্লীতে এক বাসে জনৈকা তরুণীকে ছয় নরপশু ধর্ষণ করার পর দেশ জুড়ে ব্যাপক বিক্ষোভ সমাবেশ শুরু হয়। তরুণী যখন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে দিল্লীর সফদরজঙ্গ হাসপাতালে, তখন দিল্লী, কলকাতা সহ দেশের সর্বত্র হাজার হাজার মহিলা-ছাত্র-যুব মিছিল করে পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে, মেয়েদের মুক্ত ভয়হীন জীবনের দাবিতে।

কুড়ানকুলাম পরমাণু চুল্লির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ঃ বছরভর চলা আন্দোলনগুলোর অন্যতম কুড়ানকুলামে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের বিরুদ্ধে মৎস্যজীবী, স্থানীয় মানুষ, বুদ্ধিজীবী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মীদের ধারাবাহিক বিক্ষোভ। তামিলনাড়ুর কন্যাকুমারীর অদূরে প্রস্তাবিত এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আন্দোলনরত কর্মীদের ওপর কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার ব্যাপক দমননীতি নামিয়ে এনেছে। জাপানের ফুকুশিমা পরমাণু কেন্দ্রে বিপর্যয় ও তার দৌলতে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু, বিকলাঙ্গতার টাটকা স্মৃতির পরেও পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ক্ষতির আশঙ্কা নিয়ে প্রশ্ন তোলা মানুষদের প্রধানমন্ত্রী 'দেশের শত্রু' ও বিদেশী মদতপ্রাপ্ত বলে বিতর্ক উস্কে দেন। ১ অক্টোবর, ২০১২ সি পি আই (এম এল)-এর সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর ভট্টাচার্য ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ কুড়ানকুলামে আন্দোলনকারীদের প্রতি সংহতি জানাতে গেলে ঘটনাস্থলের অনেক আগেই তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

আন্তর্জাতিক

২৩ জানুয়ারী ঃ ইরানের ইউরেনিয়াম গবেষণার পরিপ্রেক্ষিতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন আর্থিক অবরোধ শুরু করে, মার্কিন ন্যাটো অক্ষ আফগানিস্থান-ইরাকের পর নয়া নিশানা করেছে ইরানকেই।

১৯ ফেব্রুয়ারী ঃ আর্থিক অবরোধের প্রত্যুত্তরে ইরান ব্রিটেন ও ফ্রান্সে পেট্রোলিয়াম রপ্তানি বন্ধ করে দেয়।

২৭ ফেব্রুয়ারী ঃ তিউনিশিয়া-মিশরের পর আরব দুনিয়ার আরেকটি দেশে শাসকের পতন হয়। ইয়েমেনে গণবিক্ষোভের প্রেক্ষিতে আলি আবদুল্লা সালে পদত্যাগ করেন।

২৩-২৪ মে ঃ মুবারক জমানার অবসানের পর মিশরে প্রথমবারের জন্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হয়। ১৬ ও ১৭ জুন দ্বিতীয় দফা নির্বাচনের পর রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন মহম্মদ মোরসি।

৪ জুলাই ঃ লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডার যন্ত্রে হিগস-বোসন-এর অস্তিত্বের সন্ধান পদার্থবিদ্যার জগতে এক যুগান্তকারী ঘটনা হিসেবে আলোড়ন তোলে, যে কণা পদার্থের ভরের উৎস ব্যাখ্যা করতে সক্ষম।

১ অক্টোবর ঃ চলে গেলেন এরিক হবসবম (৯ জুন ১৯১৭-১ অক্টোবর ২০১২)। বিশ শতকের অন্যতম খ্যাতনামা ঐতিহাসিক হিসেবে গোটা দুনিয়ার সব মহলেই তিনি নন্দিত ছিলেন। এমনকি যারা মার্কসবাদের সমর্থক নন, তাঁরাও এই আনখশির মার্কসবাদী ঐতিহাসিকের অসামান্য অবদানকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন।

৭ অক্টোবর ঃ ভেনেজুয়েলার নির্বাচনে আমেরিকার সমর্থনপ্রাপ্ত দক্ষিণপন্থী প্রার্থীকে হারিয়ে স্যাভেজের জয় একুশ শতকের সমাজতন্ত্রের অভিমুখে আর একটি পদক্ষেপ সূচীত করল।

১৪ থেকে ২১ নভেম্বর ঃ ইজরায়েল আমেরিকার মদতে প্যালেস্টাইনের ওপর হামলা চালায়। কয়েকশো মানুষ হতাহত হয়।

২৯ নভেম্বর ঃ ইজরায়েল এবং আমেরিকার আপত্তি অগ্রাহ্য করে রাষ্ট্রসংঘের ভোটে বিপুল ব্যবধানে জয়ী হয় প্যালেস্টাইনকে অসদস্য রাষ্ট্রের মর্যাদা দেওয়ার আবেদন।

এই সমস্ত ঘটনার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ২০১২ সালে ধারাবাহিক দুটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একটি হল সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ, অন্যটি ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোর আর্থিক সঙ্কট, কৃচ্ছসাধন নীতি ও তার প্রেক্ষিতে মহাদেশজোড়া জনগণের প্রতিবাদ, বিক্ষোভ।

সি পি আই (এম এল) দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্মেলন

২২-২৩ ডিসেম্বর শংকর মিত্র নগর ও ভীম মণ্ডল মঞ্চে সি পি আই (এম এল) ৮ম দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ২০১২ সালে পার্টির দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির নেতৃত্বে জেলার সমস্ত পার্টি কমিটি ও পার্টি সদস্যদের ধারাবাহিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে জমায়েত ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়েছে। ২২ ডিসেম্বর বজবজের গৌরাঙ্গতলা থেকে মিছিল শুরু হয়। সেই মিছিলে নিউ সেন্ট্রাল জুট মিল থেকে আরও শ্রমিক যুক্ত হন। মহিলা নির্মাণ শ্রমিকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মত। শতাধিক পার্টি সদস্য-সমর্থকদের এই মিছিল প্ল্যাকার্ড ও ঝাণ্ডায় লালে লাল হয়ে ওঠে। শ্রমজীবী মানুষের উপস্থিতি বেশী থাকায় মিছিলের মেজাজ ছিল জঙ্গী। মিছিলে অংশগ্রহণ করেন রাজ্য সম্পাদক পার্থ ঘোষ ও জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত ও রাজ্য কমিটি সদস্য অতনু চক্রবর্তী। মিছিল সম্মেলন কক্ষে পৌঁছানোর পর, সেখানে এক প্রকাশ্য আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিষয় ছিল—''আসন্ন দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের প্রয়োজনীয়তা ও শ্রমজীবী মানুষের কর্তব্য''। বক্তা ছিলেন পার্থ ঘোষ ও অতনু চক্রবর্তী। শ্রোতাদের উপস্থিতিতে সম্মেলন ঘর ভর্তি হয়ে যায়। সভাঘরের বাইরেও বহু সাধারণ মানুষ বক্তব্য শোনেন। ২৩ ডিসেম্বর সকালে শহীদ স্মরণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের মূলপর্বের কাজ শুরু হয়। লাল পতাকা উত্তোলন করেন পার্টি নেত্রী জ্যোৎস্না দে, মাল্যদান করেন রাজ্য-জেলা-লোকাল কমিটির নেতৃবৃন্দ ও গণসংগঠনের জেলা কমিটির সদস্যবৃন্দ।

খসড়া প্রতিবেদনের মূল দিশা ও কর্তব্য নিয়ে বলতে গিয়ে বিদায়ী জেলা সম্পাদক বলেন, দেশ ও রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতিতে হস্তক্ষেপ আরও জোরালো করতে জেলায় আমাদের মূল মূল সমস্যাকে অতিক্রম করতে হবে। যেমন জেলা কমিটির মধ্যেকার যৌথ চর্চা-প্রজ্ঞা ও দ্রুত আন্দোলনে নেমে পড়ার মত দক্ষতা অর্জন করতে উদ্যোগ আরও বহুগুণ বাড়াতে হবে। বিগত দিনের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে সমস্ত নারী-যুব কমরেডরা এগিয়ে এসেছেন তাদেরকে পরবর্তী নেতৃত্ব হিসাবে গড়ে তুলতে দ্রুতই রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে। ক্যাডার গড়ে তোলার জন্য লাগাতার ধৈর্যশীল যত্ন সহকারে চেষ্টা চালাতে হবে। পার্টির কেন্দ্রীয় ও রাজ্য কমিটির নেওয়া কর্মসূচীতে ব্যাপক শক্তিকে দ্রুত সামিল করার সাথে সাথে জেলায় আর্থ সামাজিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিভিন্ন ইস্যুতে আন্দোলন চালাতে হবে। সর্বস্তরের পার্টি ও গণসংগঠনের কাঠামোকে শক্তিশালী করে তুলতে হবে। প্রতিবেদনের ওপর ২১ জন প্রতিনিধি বক্তব্য রাখেন। সম্মেলন পরিচালনায় ছিলেন চার সদস্যের সভাপতিমণ্ডলী—জয়দেব নস্কর, কাজল দত্ত, শিবন ধর ও লক্ষ্মীকান্ত অধিকারী। সম্মেলনের শেষ পর্যন্ত চলার পথে সাংস্কৃতিক কর্মীরা সংগ্রামী গানের মধ্য দিয়ে সবাইকে উৎসাহিত করে। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ গণসংস্কৃতি পরিষদের সম্পাদক নীতীশ রায়। দিল্লী সহ সারা দেশে ক্রমবর্ধমান নারী নির্যাতন ও ধর্ষণ বেড়ে চলার প্রতিবাদে বজবজ মহেশতলার সমস্ত বুদ্ধিজীবী, সাংস্কৃতিক কর্মী, সামাজিক কর্মী সহ সমস্ত সাধারণ মানুষকে মিছিলে সামিল হওয়ার জন্য চলার পথে সাংস্কৃতিক কর্মীরা আহ্বান জানান। কমরেড পার্থ ঘোষ ও অতনু চক্রবর্তী তাঁদের ভাষণের মধ্যে দিয়ে জেলা সম্মেলনকে আরও সমৃদ্ধ করেন। সবশেষে ১১ সদস্যের নতুন জেলা কমিটি নির্বাচিত হয়। কমরেড কিশোর সরকার জেলা সম্পাদক হিসাবে পুনর্নির্বাচিত হন।

সি পি আই (এম এল) গাইঘাটা লোকাল সম্মেলন

সি পি আই (এম এল) গাইঘাটা লোকাল কমিটির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল ৮-৯ ডিসেম্বর চাঁদপাড়া বাণীবীথি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। সম্মেলন এলাকা চাঁদপাড়া উৎসর্গ করা হয় প্রয়াত কমরেড সুবোধ টিকাদার নগর নামে। সম্মেলনকে সামনে রেখে ব্যাপক প্রচার কাজ চালানো হয়। ৮ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় গণসাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় বিদ্যালয়ে শহীদ বরুণ বিশ্বাস নামাঙ্কিত খোলা মঞ্চে। উদ্বোধনী ভাষণ দেন পার্টির জেলা কমিটির নেতা নির্মল ঘোষ। মঞ্চে উপবিষ্ট আমন্ত্রিত অতিথিদের সম্বর্ধনা জানানো হয়। গণসঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পী বাবুনি মজুমদার ও নীতীশ রায়। চাঁদপাড়ার নাট্য সংস্থা মঙ্গল কথা নাটক ও ঠাকুরনগরের পদাতিক নাট্য সংস্থা কাঁটাতার নাটক পরিবেশন করেন। এছাড়া শ্রুতিনাটক, মুকাভিনয় ও নৃত্য পরিবেশিত হয়।

পরের দিন ৯ ডিসেম্বর সম্মেলন শুরু হয়। তিন সদস্যের সভাপতিমণ্ডলীতে ছিলেন বর্ষীয়ান স্থানীয় পার্টি নেতা কেশবলাল বিশ্বাস, কার্তিক দে ও দীনবন্ধু দাস। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন জেলা পর্যবেক্ষক নির্মল ঘোষ ও রাজ্য পার্টি নেতা কৃষ্ণ প্রামাণিক। সম্মেলনে প্রতিনিধি ছিলেন ৪৭ জন, তার মধ্যে মহিলা প্রতিনিধি ছিলেন ১০ জন। মোট ১৪ জন বক্তব্য রাখেন। বক্তাদের মধ্যে মিড-ডে-মিল কর্মী হিসাবে কর্মরত পার্টি সদস্যারা মহিলাদের কম মজুরিতে কাজ করানোর সরকারি প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্য পার্টিকে বেশী বেশী সহযোগিতা করার কথা বলেন। সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষ থেকে কার্তিক দে সি পি এমের সমাজগণতান্ত্রিক ভূমিকার সমালোচনার পাশাপাশি তৃণমূলের ফ্যাসিস্ট সুলভ কার্যকলাপের বিরুদ্ধে পার্টিকে লড়াই করার আহ্বান জানান। পর্যবেক্ষক নির্মল ঘোষ জমায়েতের সংখ্যা বৃদ্ধি করা, সংগঠনের শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার কথা বলেন। কৃষ্ণ প্রমাণিক বলেন, বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বিভিন্ন পেশার মানুষদের আন্দোলনে সংগঠিত করে এলাকার জমায়েত ক্ষমতা বাড়াতে হবে। নন্দদুলাল দাস রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, বিদ্যুৎ বিল-এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করার আহ্বান জানানোর পাশাপাশি পার্টি শাখাগুলোকে আরও সক্রিয় করার অঙ্গিকার করেন। সবশেষে শিবদাসপুরে স্কুল নির্বাচনের ক্ষেত্রে সি পি আই (এম এল)-এর বুথগুলো ভেঙ্গে দিয়ে একতরফা নির্বাচিত কমিটি আত্মসাৎ করার ঘটনা সম্মেলনে ঘোষণা করা হয় এবং এই ঘটনার জন্য তৃণমূলের স্বৈরতান্ত্রিক ভূমিকাকে তীব্র সমালোচনা ও ধিক্কার জানানো হয়। সম্মেলন থেকে সর্বসম্মতিক্রমে ২ জন সহযোগী সদস্য সহ মোট ১৩ জনের কমিটি গঠন করা হয়। সম্পাদক নির্বাচিত হন নন্দদুলাল দাস।

সি পি আই (এম এল) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে মুদ্রক ও প্রকাশক কার্তিক পাল কর্তৃক ক্যালকাটা গ্রাফিক প্রাইভেট লিমিটেড, ৩এ মানিকতলা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, উল্টোডাঙ্গা, কলকাতা-৫৪ হইতে মুদ্রিত ও ২১/১/১ ক্রীক রো, কলকাতা-১৪ হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক ঃ অনিমেষ চক্রবর্তী। ₹-২ ফোন এবং ফ্যাক্স ঃ ২২৬৫ ১৬৭৯ e-mail : cpimlwb@yahoo.com//deshabrati@gmail.com